ক্ষেতমজুর আন্দোলন
শ্রেণীগত ও রাজনৈতিক তাৎপর্য

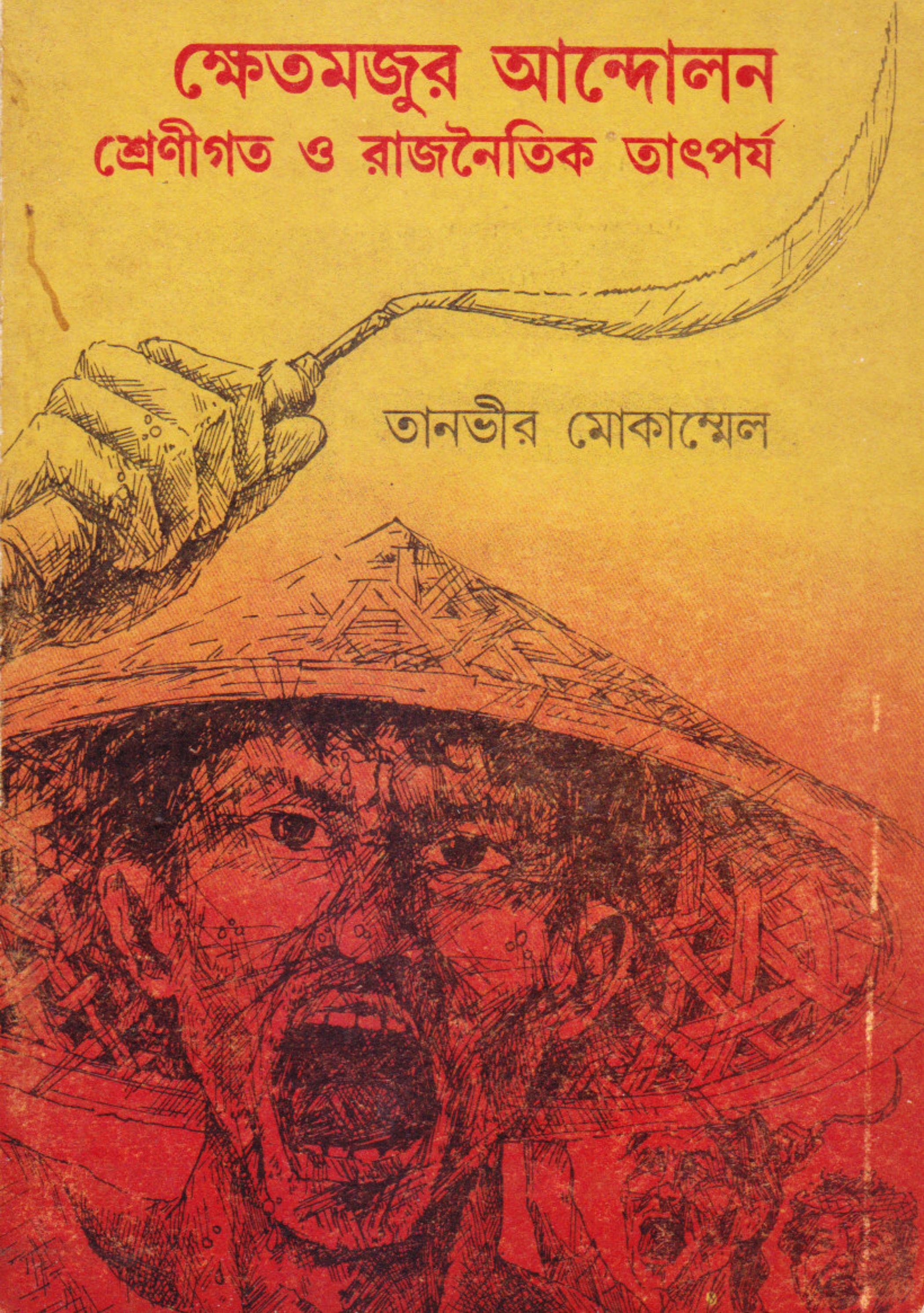

তানভীর মোকাম্মেল

প্রণিনক
২৬/৭/৭০

ক্ষেতমজুর আন্দোলন ঃ শ্রেণীগত ও রাজনৈতিক তাৎপর্য

PERSONAL COLLECTION OF ISCKRA

তানভীর মোকাম্মেল

প্রকাশিকা :

সাঈদা মোকাম্মেল

২/২, কলাবাগান লেক সার্কাস

ঢাকা

পরিবেশক : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী

৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা-২

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭

প্রচ্ছদ শিল্পী : মানজারে শামীম

মুদ্রাকর :

মোতাহার হোসেন

প্যাপিরাস প্রেস

১৫৯, আরামবাগ

ঢাকা-২

হরফ সাজিয়েছেন :

আবদুল হান্নান, মো: জামশেদ আলম, দীন মোহাম্মদ,

মো: সোহরাব হাসান, মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন

হরফ ছাপিয়েছেন :

মো: দেলোয়ার হোসেন ও সহযোগী মো: জাহাঙ্গীর আলম

মূল্য : সুলভ পঁচিশ টাকা।

শোভন পয়ত্রিশ টাকা

KHETMAJOOR ANDOLAN : SRENIGATA O RAJNAITIK TATPARYA

(Agriculture wage Labourers' Movement: Class & Political Perspectives)

By TANVIR MOKAMMEL

ভূমিকা

বাংলাদেশের বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলির দেউলিয়াত্ব যখন ক্রমশঃই প্রকাশিত হয়ে পড়ছে এবং জনগণ আন্তরিকভাবে চাইছে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি ও সংগঠনের উপস্থিতি, তখন গত কয়েক বছরে এদেশের রাজনীতিতে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ক্ষেতমজুর আন্দোলনের আবির্ভাব এক বড় ইতিবাচক ঘটনা। বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির একজন কর্মী হিসাবে কয়েক বছর এই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে যেটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, বইটি তারই একটি সার-সংক্ষেপের প্রয়াস। অনিবার্য্যভাবেই এসেছে একটি পৃথক শ্রেণী হিসেবে ক্ষেতমজুর শ্রেণীর জন্ম ও বিকাশের ইতিহাস, গ্রাম-সমাজের পৃথকীকরণ ও মেরুকরণ, ক্ষেতমজুর আন্দোলনের দাবী ও প্রেক্ষিতসমূহ। তবে বলা বাহুল্য যে, যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষেতমজুর ও কৃষক আন্দোলন করছেন বা বামপন্থী কর্মী ভাইয়েরা, বইটি মূলতঃ তাঁদের উদ্দেশ্যেই লেখা। ক্ষেতমজুর আন্দোলনের সমস্যা ও সম্ভাবনাসমূহকে সহজ ভাষায় তুলে ধরাই এই বইয়ের উদ্দেশ্য। ফলে একাডেমিক অর্থনীতিবিদ বা সমাজতত্ত্ববিদরা এ বই থেকে খুব একটা উপকৃত হবেন এমনটি আশা করি না। হলে তা' নিতান্তই আপতিক।

বইটি লেখার ব্যাপারে অনেকের কাছ থেকেই উৎসাহ পেয়েছি। ক্ষেতমজুর সমিতির সভাপতি নুরুর রহমান ও আমার একান্ত সুহৃদ অর্থনীতিবিদ এম, এম, আকাশ কষ্ট করে বইটির পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া পাঠ করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু মন্তব্য করে আমাকে অশেষ সাহায্য করেছেন। বইটি প্রকাশের ব্যাপারে নেপথ্য থেকে নিরন্তর উৎসাহ যুগিয়েছেন ক্ষেতমজুর সমিতির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। উৎসাহ পেয়েছি অর্থনীতিবিদ কমরেড অজয় রায়, বন্ধুপ্রতিম নজরুল ইসলাম, বিনায়ক সেন, মোস্তাফিজুর রহমানের কাছ থেকে। নানা কাগজ-পত্র দিয়ে সহায়তা করেছেন

বন্ধুবর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্য, আয়েশা বানু। এছাড়া ক্ষেতমজুর আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে নানারকম আলোচনা করে কমিউনিস্ট নেতা মোহাম্মদ ফরহাদ, কমরেড রতন সেন, কৃষক নেতা আবদুস সালাম ও নুহ-উল-আলম লেনিন, অর্থনীতিবিদ আতিউর রহমান, ক্ষেতমজুর আন্দোলনের আমার এককালীন সহকর্মী কাজী আকরাম হোসেন, নুরুল ইসলাম, খন্দকার ফারুক, জিয়াদ-আল-মালুম, শামসুল ইসলাম বাবলা, সুকুমার ঢালী প্রমুখের কাছ থেকে উপকার পেয়েছি।

এছাড়া ক্ষেতমজুর আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রামে-গ্রামে ঘোরার পথে যাদের সঙ্গে নানা আলোচনা ও তর্কবিতর্কের মাধ্যমে ক্ষেতমজুর আন্দোলনের স্বরূপ ও প্রেক্ষিতটা বোঝার ক্ষেত্রে উপকৃত হয়েছি সেই খুলনার ক্ষেতমজুর নেতা জাহাঙ্গীর হোসেন, পীযূষ রায়, মৃন্ময় মণ্ডল, মনোরঞ্জন মণ্ডল, যশোরের ডঃ রবিউল হক, আজিজুল হক মনি, রফিকুল ইসলাম, কুষ্টিয়ার নুরুল ইসলাম, মোহসীন আলী, ফরিদপুরের আতিউর রহমান, মালেক শিকদার, দিনাজপুরের আবুল কালাম আজাদ, রংপুরের শহীদুল ইসলাম বাবলু, কুড়িগ্রামের নুরুন্নবী ও আলম, নেত্রকোণার ব্রজগোপাল সরকার, রবীন্দ্র চক্রবর্তী, অঞ্জন ভৌমিক, বগুড়ার আবদুল মজিদ, বরিশালের আনোয়ার জাহিদ ও নোয়াখালীর আবু সাঈদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আর রয়েছেন সেই সব অগণিত ক্ষেতমজুর ভাইয়েরা যাদের সারা জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার, হীরকসম কোন বাক্য বা বাক্যাংশ, মুহূর্তে চেতনার এক একটা দিগন্তকে মেলে ধরেছে। তাদের কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। এঁদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

অনুজপ্রতিম মানজারে শামীম প্রচ্ছদ একে আমাকে কৃতজ্ঞপাশে আবদ্ধ করেছেন। আর বইটি ছাপার ব্যাপারে প্যাপিরাস প্রেসের বন্ধুপ্রতিম মোতাহার হোসেন ও প্রেসের কর্মীবৃন্দ যে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্যও আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনীর জনাব মফিদুল হকের কাছে বইটি প্রকাশে সাহায্য করা ও পরিবেশনার দায়িত্ব নেয়ার জন্যে।

তানভীর মোকাম্মেল

উৎসর্গ

এদেশের রিক্ত-নিঃস্ব ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত
করার জন্যে জেলা-উপজেলা-কেন্দ্র ও গ্রাম
পর্যায়ের সেইসব কর্মী ভাইদের প্রতি, যারা
উল্কার মত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরছেন

সূচীপত্র

পূর্বকথা	১
কৃষক থেকে ক্ষেতমজুর—এক অনিবার্য্য প্রক্রিয়া ?	৪
ভূমিহীনতা ও ক্ষেতমজুর পেশার বিকাশ	৬
শোষণের বিবিধ ও বিচিত্র রূপ	১৭
ক্ষেতমজুর সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও রূপ	১৯
ক্ষেতমজুরের উপর শোষণ : সামন্ত-অবশেষ না পুঁজিবাদী ?	২০
ভূমি-সংস্কার কমিটির রিপোর্ট, বিড়ালের পিঠাভাগ ও সরকারের শ্রেণী-চরিত্র প্রসঙ্গে	২৪
কৃষিতে ধনবাদের লক্ষণসমূহ প্রসঙ্গে	২৯
জমির মালিকানার ধরন ও ক্ষেতমজুর নিয়োগের পরিমাণ	৩৩
সেচ প্রসঙ্গে	৩৬
সার প্রসঙ্গে	৩৮
কৃষি-ঋণ ও কৃষি-পণ্যের মূল্যের ক্ষেত্রে	৪২
সরকারী আইনসমূহ : কার স্বার্থে ?	৪৭
ক্ষেতমজুরের বাঁচার দাবী—দশ দফা	৫০
কর্মসংস্থান	৫০
কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও অন্যান্য কর্মসূচী	৫৪
প্রসঙ্গ মজুরী ও মজুরী আন্দোলন	৫৮
নিম্নতম মজুরী অর্ডিন্যান্স প্রসঙ্গে	৬৩
খাস জমি সমাচার	৬৭
অন্যান্য দাবীসমূহ	৮১
ক্ষেতমজুর আন্দোলনের শত্রু-মিত্র প্রসঙ্গে	৮৮
গ্রাম ও শহরের মাথাপিছু আয়ের তারতম্য	৯০
ক্ষেতমজুরদের রাজনীতিকরণ প্রসঙ্গে	৯২
ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করার সমস্যাসমূহ	৯৭
পেটি-বুর্জোয়া গ্রাম্য-বিলাস ও নারোদনিকীয় ঝোঁকসমূহ	৯৯
সমবায়—আশু মুক্তির পথ	১০২
সমাজ-বিপ্লব—মুক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্য	১০৯
সমাজ-বিপ্লব ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম একসূত্রে গাঁথা	১১২
শেষের আগে	১১৫

PERSONAL COLLECTION OF ★ ISCKRA ★

পূর্বকথা

সংখ্যাটা নিয়ে বিতর্ক আছে। কোন পরিসংখ্যাণ বলছে শতকরা সাতান্ন ভাগ, কেউ শতকরা ষাট ভাগ, কেউ শতকরা পয়ষট্টি ভাগ। বিতর্ক আছে সংজ্ঞা নিয়েও। বছরের কোনো সময় মজুরীর বিনিময়ে অন্যের জমিতে কাজ করলেও যাদের নিজের কিছুটা জমি (এক-আধ বিঘা) আছে, কিম্বা যারা শুধু ক্ষেতে-খামারে নয়, মজুরীর বিনিময়ে কাজ করে নানা অকৃষিজ খাতে, সেইসব গ্রামীণ সর্বহারাদেরও 'ক্ষেতমজুর' আখ্যায়িত করা চলে কি না! কিন্তু যা নিয়ে কোন বিতর্ক নেই, তা' হচ্ছে কামলা, কিষান, মুনিষ, জন, বাদলা, পড়েৎ কিম্বা ক্ষেতমজুর, যে নামেই অভিহিত করা যাক না কেন, ভূমিহীন, কর্মহীন, মূঢ়-ম্লান-মূক, নিঃস্ব-রিক্ত বাংলাদেশের এই সাবঅলটার্ন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীটির নিদারুণ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দুরবস্থা সম্পর্কে।

কোন কোন গবেষক, যেমন ইরফান হাবীব যদিও জানাচ্ছেন যে সেই মুঘল আমলেও, অষ্টাদশ শতকে, এদেশে "কালজানা"[১] নামে

১. "মুঘল আমলে কৃষি-ব্যবস্থা", ইরফান হাবীব, পৃ—১৩০।

এক ধরনের পেশাজীবী ছিল যারা অন্য চাষীদের জমিতে শস্য বা মজুরীর বিনিময়ে[২] কাজ করত, কিন্তু অনেক গবেষকই মনে করেন যে গ্রামীণ সর্বহারা এই শ্রেণীটার অতিবৃদ্ধি মুলত ঘটেছে গত দেড়শ' বছরের বৃটিশ শাসন কর্তৃক প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে মার্কস-কথিত বাংলার সেই প্রায়-স্বয়ম্ভর এশিয়াটিক গ্রামগুলোর আর্থিক কাঠামো ধ্বংসের ফলে। কোন কোন মতে মৌর্য থেকে মুঘল যুগ পর্যন্ত জমির ব্যক্তি-মালিকানা সেই অর্থে না থাকায় সমাজে যে স্থবিরতা ছিল, যাকে মার্কস এশিয়াটিক সমাজ বলতে চেয়েছেন, তা' প্রচণ্ড নাড়া খেল বৃটিশ যুগে। ১৭৫৭-র পলাশীর যুদ্ধ থেকে শুরু করে ১৭৯৩ সালের কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়কালের মধ্যে আত্মপোষনশীল গ্রামীণ সমাজ-কাঠামো প্রায় ধ্বংস হোল। লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্রচাষী ও কুটির শিল্পের কারিগর জীবিকা হারিয়ে পরিণত হোল ক্ষেতমজুরে যে প্রক্রিয়াটি আরো ত্বরান্বিত হোল ছিয়াত্তরের সর্বগ্রাসী মন্বন্তরে যা প্রায় সমগ্র-গ্রাম-বাংলাকে এক মহাশ্মশানে পরিণত করেছিল। কর্মহীন বিত্তহীন এককালীন সুদক্ষ কারিগর ও প্রান্তিক চাষীদের ক্ষেতমজুরে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটা গ্রামঞ্চলে তখন থেকেই চলতে থাকে এবং বৃটিশদের প্রথম সর্বাত্মক ভূমিনীতি, ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে, এই প্রক্রিয়া একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়।

কোন কোন গবেষকের মতে মুঘল আমলে এক অর্থে জমি ছিল চাষীর অধীন, কিন্তু বাস্তবে চাষীই ছিল জমির অধীন।[৩] অর্থাৎ রায়ত নামে জমির মালিক হলেও রাষ্ট্রই তাকে বীজ বুনতে ও ফসল ফলাতে বাধ্য রাখত। তবে ইচ্ছা করলে রায়ত জমি ছেড়ে যেতে পারত। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরেই কৃষক আর জমি ছাড়ার অবস্থায় নেই। দুই বছরের অর্থনৈতিক স্থবিরতা, শিল্পের প্রসার না ঘটা, অনাবাদী জমির পরিমাণ কমতে থাকা ও জনসংখ্যা বাড়তে

২. ঐ, নিম্নরেখ বর্তমান লেখকের।

৩. "মুঘল আমলে কৃষি-ব্যবস্থা", ইরফান হাবীব, পৃ—১২৫।

থাকার ফলে কৃষকের জমির ক্ষুধাই বরং ক্রমশঃ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে।

এঙ্গেলস বলেছিলেন, "সামন্তবাদ জমি থেকে কৃষকের মুক্তির বদলে কৃষককে জমির সাথে আষ্ঠে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেই শোষণ চালায়"।[৪] কিন্তু পুঁজিবাদ করে উল্টোটা। কৃষককে সে জমি থেকে বিচ্যুত করে। পরবর্তীতে কিছু পরিসংখ্যাণের মাধ্যমে আমরা দেখাতে চেষ্টা করব যে কিভাবে গ্রামঞ্চলে পুঁজিবাদের ক্রম-অনুপ্রবেশের ফলে এককালীন স্বচ্ছল রায়তেরা জমি হারিয়ে ক্রমশঃ গরীব কৃষক ও শেষমেষ ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়েছে।

১৯৪৭ সালের আগে জমিদারীপ্রথা থাকা অবস্থাতেও গ্রামীণ সমাজ-বিন্যাস মূলত ছিল বহুগাঠনিক (multi-stuctural)। তা' শুধুই 'জমির মালিক' ও 'ভূমিহীন কৃষক' এরকম সরল ছিল না। ১৯৫০ সালে জমিদারী উচ্ছেদ আইন ("East Bengal State Acquisition and Tenancy Act" বা সংক্ষেপে "EBSA-TA") জমিদারী উচ্ছেদ করল বটে, এবং তার ফলে হিন্দু জমিদাররা ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ করলেও, এর ফলে স্ফীতি ঘটল মূলত চাপের-মুখে-সস্তায়-জমি-কিনে বা লুটপাটের মাধ্যমে, মুসলমান কুলাক বা জোতদার শ্রেণীটিরই। জমিদারী উচ্ছেদ আইনে উদ্বৃত্ত জমি ৩৩ একর সিলিং-এ (মাথাপিছু ১০ বিঘা ও পরিবার পিছু ১০০ বিঘা) বিলি করার যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তা' কখনোই কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া হয়নি এবং এর ফলে লাভ জোটে মূলতঃ মুসলমান জোতদার শ্রেণীটিরই। সাধারণ মুসলমান দরিদ্র কৃষক ক্ষেতমজুরদের দেশভাগের ফলে খুব একটা লাভ হয়নি। ধলাকর্তা দেশত্যাগ করলেও মকবুল-দের[৫] ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি, যদিও জমির তীব্র ক্ষুধাসম্পন্ন গরীব কৃষক ও ভূমিহীনদের মধ্যে জমি প্রাপ্তির লোভ দেখিয়েই পাকিস্তানের পক্ষে তীব্র আবেগ সৃষ্টি করা হয়েছিল। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইউব ক্ষমতায় এসে জমির সিলিং ৩৭৫ বিঘায় বাড়িয়ে দেয়। গ্রামে

৪. মার্কস-এঙ্গেলসের রচনা-সংগ্রহ, খণ্ড—২১, পৃ—৩৪১।

৫. রাজেন তরফদার পরিচালিত "পালঙ্ক" চলচ্চিত্রের একটি চরিত্র।

একটা শক্তিশালী উদ্বৃত্ত শ্রেণী তার শাসনের ভিত্তি হিসাবে (আমাদের বর্তমান সামরিক সরকারের মতই) তার প্রয়োজন ছিল, যা তথাকথিত "মৌলিক গণতন্ত্র"-এর নামে পরে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়।

পাকিস্তান আমলটাতে আমরা দেখেছি দেশের প্রায় বারো আনা জমি, যা ছিল কোন "হিন্দু" নামে, তা' কোনো "মুসলমান" নামে হাতবদল হয়েছে। পাকিস্তানের গোটা চব্বিশ বছরে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এটা ছিল অন্যতম মূল পলিটিক্যাল ইকনমি। ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধের পর "শত্রু-সম্পত্তি" নামে হিন্দু পরিবারগুলোর জমি বাজেয়াপ্ত করার যে আইন করা হয় ("অর্পিত সম্পত্তি" নামে যে ধারা এখনও চলছে), তার ফলেও বহু প্রান্তিক ও গরীব হিন্দু চাষী জমি হারিয়ে ভূমিহীন হয়েছে। তবে পাকিস্তানী রাষ্ট্র-যন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি সাম্প্রদায়িকতা মজুরী-শ্রমে আবদ্ধ ক্ষেতমজুরদের দৈনন্দিন জীবনে তেমন কোনো ছায়াপাত ঘটাতে পারেনি। সম্প্রতি সাতক্ষীরার শ্যামনগর থেকে প্রায় দুইশত মুসলমান ক্ষেতমজুর পরিবারের ভারতে দেশান্তরী হওয়ার ঘটনা (ভারতে মজুরী বেশী) জিন্নাহ্ সাহেবের দ্বি-জাতি তত্ত্বের গণেশ আরেকবার ভুট্ করে এই সত্যই প্রমাণ করল যে, সবার উপরে অর্থনীতি সত্য, তাহার উপরে নাই!

কৃষক থেকে ক্ষেতমজুর—এক অনিবার্য প্রক্রিয়া ?

ক্ষুদে আত্মপোষণশীল কৃষক, যারা ছিল এক সময় গ্রাম-বাংলার প্রধান জনসমষ্টি, সেই ক্ষুদে কৃষক সম্পর্কে মার্কসের একটি সংজ্ঞা রয়েছে ; "ক্ষুদে জোত-জমার কৃষক সম্প্রদায় একটি বিশাল জনসমষ্টি, তাদের জীবনযাত্রার পরিবেশ অনুকূল ; কিন্তু সেটা তাদের মধ্যে বহুধা সংযোগ স্থাপনের বদলে তাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। প্রত্যেকটি কৃষক পরিবার প্রায় স্বয়ম্ভর, সে ভোগ্যবস্তুর প্রধান অংশটা সরাসরি নিজেই উৎপাদন করে, এইভাবে জীবনোপায় সংগ্রহ করে সামাজিক সংঘর্ষের চেয়ে প্রকৃতির সঙ্গে বিনিয়োগের

সাহায্যেই বেশী।"[৬]

বিগত বৎসরগুলিতে এই আত্মপোষণশীল ক্ষুদে কৃষক কিভাবে জমি হারিয়ে ভূমিহীন সর্বহারা ও ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়েছে, তা' বহু গবেষকই তাদের গবেষণাকর্মে তুলে ধরেছেন। অতীতযুগে আমাদের দেশে ভূমিহীন কোনো কৃষক-পরিবার ছিল না। কিন্তু আজ? ১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষি-জরীপে দেখা যাচ্ছে গ্রামাঞ্চলে ভিটেমাটি শূন্য সর্বহারা পরিবার ৯%, কোনোরকম একটা ভিটেমাটি কুঁড়েঘর রয়েছে কিন্তু কোনো কৃষিজমি নেই এরকম পরিবারের সংখ্যা ২০%, আর প্রায় ভূমিহীন ২৮%। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে সব মিলিয়ে সর্বহারা-আধা সর্বহারা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মোট সংখ্যা ৫৭%। এটা সরকারী হিসাব। বেসরকারী অর্থনীতিবিদ্‌দের হিসেবে এই সংখ্যা প্রায় ৬০%। এই সর্বহারা ও আধা-সর্বহারা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে শুধুমাত্র শ্রম বিক্রী করেই জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। এছাড়া স্বল্প জমির গরীব কৃষক ও বর্গাদারদেরও বছরে একটা বড় সময় শ্রম বিক্রী করে বেঁচে থাকতে হয়। ২·৫০ একরের কম জমি আবাদকারীদের মধ্যে ৪১% পরিবার তাদের জীবিকার জন্যে শ্রমশক্তি বিক্রী করতে বাধ্য হয়। সব মিলিয়ে কৃষি ও অকৃষিজ ক্ষেত্রে গ্রামীণ শ্রমবিক্রেতার পরিমাণ ৭০% এর উর্ধ্বে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্বল্প-মজুরী, কর্মসংস্থানের সুযোগ কম ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এরা সকলেই মানবেতর জীবন যাপন করছেন। সরকারী হিসেবেই ৮৭·৬% মানুষ দু'বেলা খাওয়া পায় না এবং ৫৩·৬% একবেলাও ঠিকমত খাবার পায় না, অর্থাৎ রয়েছে, চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে।

১৯৬৩-৬৪ সালে গ্রামীণ পরিবারের গড় আয় ছিল শহরে বসবাসরত পরিবারের আয়ের ৬২%। ১৯৭৬-৭৭ সালে তা' কমে দাঁড়ায় ৫৬%। শহরে পরিবারের আয় যেখানে কমেছে ১১%, গ্রামের ২০%। আবার পাশাপাশি গ্রামের ভেতরেও গত দশকে গ্রামীণ পরিবারের নিম্ন ৪০%-এর আয় হ্রাস পেয়েছে ৮% এবং উর্ধ্ব ১০%-এর আয় বেড়েছে ১৫%। বোঝাই যায় গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র

৬. মার্কস-এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ—১২১।

হওয়ায় প্রক্রিয়া দ্রুত হারে সম্পন্ন হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদের ক্রমপ্রবেশ ও সাম্রাজ্যবাদী বাজার অর্থনীতির লীলাখেলায় কৃষক যা বেচে তার দাম পায় না, আর যা কেনে তার মূল্য আকাশচুম্বী। কৃষককে চুষে ছোবড়া বানানো হচ্ছে। ফলে গরীব, এমনকি মাঝারী কৃষক দ্রুতই জমি হারাচ্ছে। ঘটছে ব্যাপকহারে বি-কৃষকায়ণ (de-peasantisation)। এরা দেশের ভূমিহীন বাহিনীতে যোগ দিয়ে ক্ষেতমজুরে পরিণত হ'চ্ছে। এই আত্মপোষণশীল ক্ষুদে কৃষকদের এটাই নিয়তি যে কৃষিতে পুঁজিবাদ আরো যত বিকশিত হবে ততই এরা আরো নির্মমভাবে ও আরো ব্যাপকতর সংখ্যায় সর্বহারায় পরিণত হবে এবং মজুরী শ্রমে বাধ্য হবে।

ভূমিহীনতা ও ক্ষেতমজুর পেশার বিকাশ

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে কৃষকের ভূমিহীনতার হার ক্রমশঃ বেড়েছে। এ সময়কাল থেকেই নানা কারণে, যথা গ্রামের ঐতিহ্যবাহী শিল্পসমূহ নষ্ট হওয়া, জমি কেনাবেচার পণ্যে পরিণত হওয়া, মহাজনী শোষণ কিম্বা জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি, ইত্যাদি কারণে গ্রামে নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় এবং গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এই ভূমিহীনদের একাংশ হো'ল বর্গাচাষী, আরেক অংশ হো'ল ক্ষেতমজুর। অবশ্য তখন যারা ক্ষেতমজুরী করতেন, তাদের খুব সামান্য সংখ্যকই বিশুদ্ধ ক্ষেতমজুর ছিলেন। বছরের অধিকাংশ সময়টাতেই তারা নানা অকৃষিজ কাজে নিয়োজিত থাকতেন।

এরপর থেকে আজ পর্যন্ত কৃষকের জমি হারিয়ে ভূমিহীন ক্ষেত-মজুরে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটা বেড়েই চলতে থাকে। উনিশ শতকের শেষের দিকে তৎকালীন উপনিবেশিক প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত এক গোপন সমীক্ষায় (যা ডাফরিন রিপোর্ট নামে খ্যাত ও দীর্ঘদিন অপ্রকাশিত) দেখা যায় যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায়

৬ থেকে ২৩ শতাংশ পর্যন্ত গ্রামীণ পরিবার মজুরী শ্রমের উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল ছিল।[৭]

আর, এক হিসাবে, এই শতকের গোড়া থেকে মোট জনসংখ্যার সাথে কৃষি-শ্রমিকদের অনুপাত ছিল,

১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১[৮]
২১·০	২৪·৮	২০·৬	৩১·৩

১৯৩০-এর দশকে আমরা দেখি যে বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্রের সংকট-কাল বাংলার কৃষককেও রেহাই দেয়নি। গ্রাম-বাংলায় নিঃস্বকরণ বেড়েছে। ১৯২৬-৩৮ এই বারো বছরে ব্যাপকহারে গরীব কৃষকদের জমি চলে গেছে ধনী কৃষক বা মহাজনদের হাতে। তখন জমির মালিকানার হারটা ছিল এরকম; মোট আবাদী জমির ৩৮% খোদ খামারে, ৩১·৭% ভাগচাষে, ৫·৭% ক্ষেতমজুর দিয়ে এবং ২৪·৬% জমি নিম্নস্বত্ব রায়ত দিয়ে চাষ করা হোত।[৯] অর্থাৎ আবাদী জমির ⅓-এরও বেশী তখন চাষ হচ্ছিল বর্গা প্রথায়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এসময় আগামীদিনের সম্ভাব্য ক্ষেতমজুরদের এক বড় অংশ মূলতঃ বর্গাচাষী রূপেই নিজেদের প্রচ্ছন্ন রেখেছিল। আর ১৯৩৯-এর ভূমি রাজস্ব কমিশন রিপোর্টে দেখি যে ভূমির মালিকানাবিচ্যুত মজুরী শ্রমের উপর নির্ভরশীল পরিবারের হার ছিল মোট পরিবারের ১৮ শতাংশ।[১০]

আর ১৯৪০ সাল নাগাদ ক্রমে দেখি যে মোট কৃষি পরিবারের ১২·২% পরিবার হচ্ছে ভাগচাষী, পক্ষান্তরে ২২·৫% পরিবার ক্ষেত-

---

৭. "বাংলাদেশে ভূমিহীনতার সমস্যা ও খাস জমি বণ্টন", হোসেন জিল্লুর রহমান, দৈনিক 'সংবাদ', ১৩ই জুলাই, ১৯৮৭।

৮. "বাংলাদেশে ভূমি-ব্যবস্থা : সমস্যা ও সমাধান", অজয় রায়, পৃ—৯৯।

৯. "বাংলাদেশে কৃষি-শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পর থেকে সমসাময়িক বাংলাদেশ পর্যন্ত", আয়েশা বানু, সন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ১৯৮৭, পৃঃ—২১।

১০. "বাংলাদেশে ভূমিহীনতার সমস্যা ও খাস জমি বণ্টন", হোসেন জিল্লুর রহমান, দৈনিক "সংবাদ", ১৩ই জুলাই, ১৯৮৭।

মজুর। অর্থাৎ গ্রামের গরীব মানুষদের মধ্যে ক্ষেতমজুররা হয়ে উঠেছে অপেক্ষাকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ।[১১]

পঞ্চাশের ভয়াবহ মন্বন্তরে চালের দাম ২০ গুণ পর্যন্ত বেড়ে যাওয়াতে গ্রাম-বাংলায় যে ৩০ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে, সেই দুর্ভিক্ষের করুণ দিনগুলিতে গরীব ও প্রান্তিক চাষীরা ব্যাপকহারে জমি হারায়; "...... জমি বিক্রী বাড়ে ১৫ গুণ। ৫% কৃষক তাদের সমস্ত জমি এবং ১১% কিছু না কিছু জমি বিক্রী করতে বাধ্য হয়।"[১২]

১৯৪৪-৪৫ সালের সরকারী বিবরণ অনুসারে বাংলায় ভূমিহীন, গরীব, মধ্য ও ধনী কৃষকদের অবস্থান ছিল নিম্নরূপ :

	কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত মোট জনসংখ্যার কত অংশ	আবাদী জমির কত অংশ তাদের হাতে
ক) ভূমিহীন	৩৬·৪	১·৬
খ) ১ একরের কম এমন পরিবার	১৭·৭	৪·২
গ) ১ একরের বেশী কিন্তু ৩ একরের কম	২২·০	১৬·৯
ঘ) ৩ একরের বেশী কিন্তু ৫ একরের কম	৯·৬	১৪·৭
ঙ) ৫ একরের বেশী	১৪·৩	৬২·৪([১৩])

আর ১৯৪৬ সালে জনাব ইসহাক কর্তৃক ৭৭টি গ্রামের জরীপের ফল হিসাবে আমরা দেখি যে এক-চতুর্থাংশ কৃষকই ভূমিহীন। এছাড়া এক একরের কম যাদের জমি এমন বর্গাচাষীদের ধরলে ৫০%-ই

---

১১. আয়েশা বানু, পূর্বোক্ত সন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, পৃ—২২।

১২. ঐ, পৃ—২৩।

১৩. "বাংলাদেশে ভূমি-ব্যবস্থা : সমস্যা ও সমাধান", অজয় রায়, পৃ—১৫-১৬।

ভূমিহীন বা প্রায় ভূমিহীন।[১৪]

এর পরের পর্যায় সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ অজয় রায় জানাচ্ছেন যে, "১৯৫১ সালের আদমশুমারী অনুসারে কৃষিতে নিযুক্ত মোট শ্রমশক্তির (labour force) শতকরা ১৪ ভাগ ছিল ভূমিহীন শ্রমিক (১২ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের)। ১৯৬১ সালের আদমশুমারীতে দেখা যায় এই সংখ্যা বেড়ে শতকরা ১৭ ভাগে পরিণত হয়েছে। আরও দেখা যায়, কৃষিতে নিযুক্ত মোট শ্রমশক্তির (labour foorce) আরও শতকরা ৭ ভাগ মজুরীর বিনিময়ে কাজের উপর হয় পুরোপুরি না হয় আংশিকভাবে নির্ভরশীল। কৃষি সম্পর্কিত মাস্টার সার্ভেতে (৫ম রাউণ্ড ১৯৬৪/৬৫) দেখা যায় ধান উৎপাদনে নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তির (labour force) শতকরা ৩২ ভাগ মজুরী-শ্রমের বিনিময়ে কাজ করে থাকে। ১৯৭৩-৭৪ সালে আই, আর, ডি, পি-র (IRDP) বেঞ্চমার্ক সার্ভেতে দেখা যায় বাংলাদেশের ১২টি জেলার ৭৭১০টি গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা শতকরা ৩৮ টি। ভূমিহীন পরিবার বলতে বোঝানো হয়েছে এমন পরিবার

(ক) যাদের কোনো চাষের জমি নেই, (খ) যাদের বাড়ীতে ভিটার আয়তন ০.৩ একরের বেশী নয়। ১৯৭৭ সালের ল্যাণ্ড অকুপেন্সি সার্ভেতে (Land Occupancy Survey) দেখা যায় গ্রামীণ পরিবারগুলির মধ্যে শতকরা ৩৩ ভাগ ভূমিহীন। এই সার্ভেতে দেখা যায় শতকরা ১১ ভাগ পরিবারের কোনো ভিটাবাড়ী নেই, এরা সম্পূর্ণ ছিন্নমূল। শতকরা ১৫ ভাগ পরিবারের ভিটা-বাড়ী ছাড়া কিছু জমি আছে তবে তা' ০.৫ একরের বেশী নয়। এদের ভূমিহীনের পর্যায়ে ধরলে ভূমিহীনের পরিমাণ ৪৮ ভাগে দাঁড়ায়।"[১৫]

আর ১৯৮২-র বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো অনুযায়ী মোট পরিবারের শতকরা ১৫ ভাগ পুরোপুরিই ভিটেমাটির মালিকানাবিহীন ছিন্নমূল।

---

১৪. ঐ, পৃ—১৫।

১৫. ঐ, পৃ—১০৫,

PERSONAL COLLECTION OF

বাংলাদেশে জমির মালিকানার ধরণ সম্পর্কে রেহমান সোবহান কৃত ১৯৭৮ সালের একটি জরীপও নীচে তুলে ধরা হোল।

বিবরণ	গ্রামীণ পরিবারের শতকরা হিসাব ১৯৭৮	জমির মালিকানার শতকরা হিসাব ১৯৭৮
১। কাজের নিরিখে জমিহীন পরিবার	৫৮'২	—
ক) ভূমিহীন পরিবার বা মাত্র বসতভিটা আছে	২৮'৯	—
খ) ০'৫ একরের নীচে (ক বাদে) এমন পরিবার	২৯'৩	২১'৭
২। মোটামুটি চলে যায় এমন পরিবার (০'৫-২) একর	২৬'৪	—
৩। মাঝারী কৃষক		
ক) ২-৫ একর	১৫'৭	৩০'৪
খ) ৫-১০ একর	৫'৭	২২'৭
৪। ধনী কৃষক (১০ একর ও তার উর্ধ্বে)	২'৫	২৫'৭ (১৬)

এ প্রসঙ্গে অন্যান্য আরো পরিসংখ্যানের জটিলতায় না যেয়ে আমরা এদেশে ভূমিহীন হওয়ার বিগত পঞ্চাশ বছরের যে ছকটি গবেষিকা আয়েশা বানু করেছেন, সেটাই তুলে ধরছি ;

---

১৬. রেহমান সোবহান : "বাংলাদেশের উন্নয়ন ধরণের উপর বৈদেশিক উপাদানের প্রভাব", উদ্ধৃত, আয়েশা বানু, প্রাগুক্ত, পৃ—৪৬।

ক্রমিক নং	বছর	উৎস	তথ্য
১)	১৯৩৮-৪০	ফ্লাউড কমিশন রিপোর্ট	বর্গাচাষী + কৃষি শ্রমিক = ভূমিহীন হলে ভূমিহীন পরিবারের আপেক্ষিক গুরুত্ব—৩০·৬ %
২)	১৯৪২-৪৫	রামকৃষ্ণ মুখার্জী —"বাংলাদেশের ছয়টি গ্রাম" নমুনা জরীপ	বর্গাচাষী + কৃষি-শ্রমিক + ভিক্ষুক = ভূমিহীন কৃষক ও ভূমিহীন হওয়ায় আপেক্ষিক গুরুত্ব – ৩৫%
৩)	১৯৪৪-৪৫	ইসহাক রিপোর্ট —প্লট বাই প্লট, বাংলার ৭৭টি সাব-ডিভিশনের ৭৭টি গ্রাম	যাদের বড়জোর বাস্তুভিটা আছে = ভূমিহীন কৃষক ও ভূমিহীন আপেক্ষিক গুরুত্ব—৩০%
৪)	১৯৫১	* সেন্সাস রিপোর্ট পূর্ববঙ্গ (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান) সরকারী হিসাব	* ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের অনুপাত (রাখালরা বাদে) আপেক্ষিক গুরুত্ব —১৪·৭৫%
৫)	১৯৬০	* তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানী সরকারী সার্ভে, ১৯৬২ সালে গৃহীত	* সংকীর্ণ সংজ্ঞায় (রাখালরা বাদে) ভূমিহীনের আপেক্ষিক গুরুত্ব —১৭·৫২%
৬)	১৯৬৮	* বাংলাদেশ সরকার সেন্সাস রিপোর্ট (১৯৭১)	* ভূমিহীনের সংখ্যা = ২০%
৭)	১৯৭৩-৭৪	আই, আর ডি, পি বেঞ্চ মার্ক সার্ভে (১৪টি গ্রামের নমুনা জরীপ)	যাদের বড় জোর বাস্তুভিটা আছে = ভূমিহীন আপেক্ষিক গুরুত্ব ২৮%

৮)	১৯৭৭	ল্যাণ্ড অকুপেন্সি সার্ভে (৪০০টি গ্রামের নমুনা জরীপ)	যাদের বড় জোর বাস্তু-ভিটা আছে এবং মালি-কানাধীন জমির পরিমাণ ৫ একরের কম = ভূমি-হীন কৃষক। আপেক্ষিক গুরুত্ব—৩২·৭৯%
৯)	১৯৭৯	ঐ	যাদের বড়জোর বাস্তু-ভিটা আছে এবং মালি-কানাধীন জমির পরিমাণ ০·৫ একরের কম = ভূমি হীন কৃষক। আপেক্ষিক গুরুত্ব—৪১·৪১%
১০)	১৯৮৩-৮৪	সর্বশেষ কৃষিশুমারী	ভিটেমাটি শূন্য সর্বহারা পরিবার = ৯% কোনোরকম একটু ভিটে-মাটি আছে কিন্তু আবা-দের জমি নাই = ২০% অতি অল্প কৃষিজমি, অন্যের জমিতে বর্গা চাষ করে = ২৮%। মোট = ৫৭% ([১৭])

ছকটির ৪, ৫, ৬ নং ছকের তথ্যের উৎস সরকারী রিপোর্ট যেখানে ভূমিহীনদের সংখ্যা খুবই সংকীর্ণ অর্থে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যে কারণে ভূমিহীনদের আপেক্ষিক গুরুত্ব অন্যান্য বছরের তুলনায় এতটা কম দেখাচ্ছে, যা মোটেই বাস্তব চিত্র নয় বলে অর্থ-নীতিবিদ ও গ্রাম-গবেষকেরা মনে করেন। এছাড়া সর্বশেষ শুমারীতে

১৭. আয়েশা বানু, প্রাগুক্ত, পৃ—৫৭।

ভূমিহীনের মোট সংখ্যা ৫৭% যা দেখানো হয়েছে, তা বর্তমানে ৬০% ছাড়িয়ে গেছে বলেই অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ ও গ্রাম-গবেষক একমত। আর এই সংখ্যাও পুরো চিত্রটা হয়তো তুলে ধরে না। কারণ ইতিমধ্যেই বাঁচার যুদ্ধে গ্রামীণ ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর এক বড় অংশ শহরে এসে ভাসমান জনগোষ্ঠীর ভীড়ে চলে এসেছে।

অর্থনীতিবিদ এ আর খানেরও একটি জরীপ রয়েছে। ওঁর হিসাবে,

বছর	কৃষি কাজের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িতদের মধ্যে শতকরা কত ভাগ ভূমিহীন	ভূমিহীন শ্রমিকের সংখ্যা ১০ লক্ষ
১৯৫১	১৪·৩	১·৫১
১৯৬১	১৭·৫	২·৪৭
১৯৬৭-৬৮	১৯·৮	৩·৪০
১৯৭৭	—	৩৫·৩২ (১৮)

১৯৬৭ থেকে ১৯৭৭-র এই দশ বছরের মধ্যে ভূমিহীনের সংখ্যা দেখা যায় ১১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে! অবশ্য ১৯৭৭-এ যাদের ভূমিহীনের মধ্যে ধরা হয়েছিল তাদের মধ্যে বাড়ী আছে বা নেই তবে ০·৫ একর জমি আছে, এদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তবুও ভূমিহীনের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে দেখা যায়। এ. আর. খান জানাচ্ছেন যে ১৯৫১-৭৭ এই সময়কালটাতে দেশে ভূমিহীনের সংখ্যা ৫½ চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৯] নিঃসন্দেহে আশির দশকে এই হার আরও তীব্র।

এর মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে ক্ষেতমজুরদের সংখ্যাবৃদ্ধির হারটা কি, তা' আমরা নীচের সারণীটা থেকে বুঝতে পারব ;

১৮. Dr. A. R. Khan—"Poverty and Inequality in Rural Bangladesh", পৃ—১৬০।

১৯. ঐ, পৃ—১৬০।

কৃষি জনগোষ্ঠী	১৯৬১	১৯৭৪	%১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত বৃদ্ধির হার
	হাজারের ঘরে বিবেচ্য		
মালিক চাষী	৫১৬০ (৩৪.৭%)	৪৯৯৩ (৩১.১%)	—৩.২
একাধারে কিছু জমির মালিক ও বর্গাচাষী	১৫৫৬ (১০.৫%)	২০৮৬ (১৩.২%)	+৩৪.১
নিঃস্ব বর্গাচাষী	৫১৮ (৩.৫%)	৫৪৮ (৩.৪%)	—৫.৮
কৃষি-শ্রমিক	২৮১৬ (১৮.৯%)	৩৯৩৬ (২৪.৯%)	+৩৯.৭
অবেতনভোগী পারিবারিক শ্রম	৪৮৮১ (৩২.৪%)	৪৩৩৭ (২৭.৪%)	—১২.২
মোট	১৪৯৩২ (১০০%)	১৫৭৯৮ (১০০%)	+৬.৫ (২০)

* বন্ধনীবদ্ধ সংখ্যাগুলি মোট জনসংখ্যার শতকরা পরিমাণ নির্দেশক।

এই সারণী অনুযায়ী ১৯৬১ থেকে ১৯৭৪ সাল এই সময়পর্বটাতে দেশে ক্ষেতমজুর বৃদ্ধির হার ছিল ৩৯.৭% অর্থাৎ শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ।

এই ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনতার নানাবিধ কারণই রয়েছে। দু'একটি কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখও করেছি। মূল মূল কারণসমূহ হচ্ছে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ, কৃষির প্রতিকূলে বাণিজ্যের শর্ত, দেশে শিল্পায়ন না ঘটা, মুসলিম উত্তরাধিকার আইন, শহর কর্তৃক গ্রাম শোষণ, গ্রামের ভেতরে মহাজনী ও অন্যান্য নানাবিধ শোষণ এবং

২০. উৎস: ১৯৭৪-এর জনসংখ্যা শুমারী।

কৃষিতে ধনবাদ বিস্তারের লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদের পরামর্শে বিভিন্ন সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিসমূহ। এর মধ্যে কোন্ কারণটি বেশী ভূমিকা রেখেছে প্রশ্ন তুললে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা একযোগে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিকে আঙ্গুল তোলেন। কিন্তু পরবর্তীতে আমরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও ভূমিহীন বৃদ্ধির হারের প্রতিতুলনা করে দেখাতে চেষ্টা করব যে এটি মূল কারণ নয়। কৃষির প্রতিকূলে বাণিজ্যের শর্তের কারণে ফসলের দাম না পেতে পেতে গরীব কৃষক জমি হারিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে এটা সত্য হলেও, এই কারণ দিয়েই এই ব্যাপক ভূমিহীনতার ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যায় না। শহরে পর্যাপ্ত কল-কারখানা না হওয়াতে ইউরোপের মত গ্রামের ভূমিহীন শ্রেণী শহুরে প্রলেতারিয়েত হয়নি, বরং নিঃস্ব হয়ে গ্রামের বোঝা বাড়িয়েছে কিম্বা শহরে এসে কাজের খোঁজে ঘুরে ঘুরে অবশেষে ফুটপাতে বেওয়ারিশ লাশ হয়ে মরেছে; এটা সত্য। তবে পরিসংখ্যাণ বলে ভূমিহীনতা ও নিঃস্বকরণের সেটাও মূল কারণ নয়। উত্তরাধিকার আইনের ফলে জমি খণ্ড-বিখণ্ড হতে হতে একটা অলাভজনক (Non-viable) বন্ধনে পরিণত হয়ে থাকে। ধনীদের সন্তানেরা জমি ছাড়াও অন্যত্র চাকুরী বা ব্যবসায় যেতে পারে, কিন্তু গরীব কৃষকের ছেলেদের জমি আঁকড়ে পড়ে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না এবং তারা কার্যতঃ ভূমিহীনই হয়ে পড়ে। তবে এই সব কারণকে ছাপিয়েও যে কারণটি মুখ্য হয়ে ওঠে তা'হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে ধনবাদ প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতি। কারণ আমরা আগেই বলেছি, ধনবাদ গ্রামের গরীবের শ্রমশক্তিকে শোষণ করতে চায় তাকে জমি থেকে ছুটিয়ে। বাংলাদেশে আজ কোটি কোটি ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের যে করুণ হাল, তা' কোনো সরকারী নীতির অনুপস্থিতি বা অবহেলা নয়, বরং তা' হচ্ছে আমলা-মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিরই অবশ্যাম্ভাবী ফল। পরবর্তীতে আমরা এসব নীতি ও ক্ষেতমজুরদের জীবনে তার প্রভাব ও ফল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রাখি।

তবে এসব নীতির ফলে শুধু মাত্র ভূমিহীন ক্ষেতমজুরই নয়, মধ্য-

কৃষকও আজ বিপর্যস্ত। সে তার পাট, তামাক, ধান ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের দাম পায় না, কিন্তু সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি যেসব কৃষি-উপকরণ সে কেনে, তার দাম ক্রমশঃই তার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। একদিন মধ্যম পরিমাণ (২·৫ একর থেকে ৭·৫ একর) জমির মালিক পরিবারগুলো আমাদের দেশের জমির সিংহ-ভাগ নিয়ন্ত্রণ করত (মোট আবাদী জমির ৪৫%)। কিন্তু ১৯৭১ সালের কৃষিশুমারীর হিসাবে দেখা যায় যে তাদের সংখ্যা ১৯৭৭ সালে ৪১% থেকে কমে বর্তমানে মাত্র ১৫%-এ এসে দাঁড়িয়েছে। এই তথ্য প্রমাণ করে যে মাঝারি কৃষক ক্রমাগতভাবে অভাবী গরীব কৃষকে পরিণত হচ্ছে। ফলে গরীব কৃষকের সংখ্যাও বিগত কয়েক বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ২০%। পাশাপাশি জমির কেন্দ্রীভবন যে হ'চ্ছে তার প্রমাণ ১৯৭৮ সালের জরীপে দেখা যাচ্ছে গ্রামের উপরের মাত্র ৮·৫% মোট জমির ৪৮·৪%, অর্থাৎ অর্ধেকের মত জমির মালিক।

জমি ছাড়াও কৃষকরা হারাচ্ছেন গরু। কৃষিজীবনে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বেশী বলার অপেক্ষা রাখে না। এটা সম্পদেরও সূচক, যেমন রুশ দেশে পুঁজিবাদের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনায় লেনিন কৃষকের ঘোড়াকে[২১] ধরেছিলেন কৃষকের সম্পদের সূচক হিসেবে।

কৃষি ঋণের সার্টিফিকেট জারী, অস্থাবর মালক্রোক, বডিওয়ারেন্ট, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদিতেও মাঝারী ও ছোট কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হ'চ্ছে। লুটেরা বুর্জোয়ারা শিল্প-ব্যাঙ্ক ও শিল্প-ঋণ সংস্থার হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ গায়েব করে দিয়েও দিব্যি পার পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু উত্তরবঙ্গের "মাটির ডাক" বা সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হলেও কৃষিঋণের সুদ প্রদানের বাধ্যবাধকতা গরীব কৃষকদের বিপর্যস্ত করে চলেছে।

শিশুপাঠ্য বইতে যেরকম লেখা থাকে দেশের শতকরা আশি ভাগ কৃষক, এ তথ্য আজ আর সত্য নয়। গ্রামীণ জনশক্তির শুধু ৬১%

---

২১. "Development of Capitalism in Russia",—V. I. Lenin.

আজ কৃষি-উৎপাদনে জড়িত।[২২] অন্যান্যরা অন্যান্য নানা পেশায় কিম্বা কর্মহীনতায়। কর্মবিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই দ্রুত বি-কৃষিকরণ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের এক সাম্প্রতিক চিত্র।

আমরা আগেই বলেছি যে আদি ক্ষেতমজুরদের এক বড় অংশ এসেছে অকৃষিজ শ্রেণী থেকে, ফসল কাটার সময় ঠিকে-শ্রমিক হিসেবে। তাদের কারো যদি দু'এক বিঘে জমি থাকে, স্ব-হালে বা বর্গায়, সেটা বড় বিবেচ্য নয়। কারণ শুধুমাত্র জমি কিছু থাকা বা না-থাকার বিচারে শ্রেণী-নির্ধারণ মার্কসবাদসম্মত নয়। অন্যান্য আয়ের উৎসকেও হিসেবে রাখতে হবে। যেটা মূল বিবেচনার বিষয় হবে তা' হ'চ্ছে শ্রমবাজারে ভূমিকাটি কার কি? সেদিক থেকে এখনও এক-আধ-বিঘে জমি স্ব-হালে বা বর্গায় চাষ করছে যে কৃষক, কিন্তু যার আয়ের প্রধান অংশ মজুরী শ্রম, সেও—ক্ষেতমজুরই।

এছাড়া গত কয়েক বছরে গ্রামীণ সর্বহারা ও আধা-সর্বহারা পরিবারগুলোর লক্ষ লক্ষ মহিলা ও শিশুও ক্ষেতমজুরীর কাজ শুরু করেছে।

এসব কারণে গত ১৪ বছরে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা ৩৩% থেকে বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে এবং ১৯৮২ সালের পরিসংখ্যাণ অনুযায়ী প্রায় ৬২ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারকে আজ জীবিকার জন্য কোন না কোনভাবে শুধুমাত্র নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রীর উপরই নির্ভর করতে হ'চ্ছে পরিবারসহ যাদের মোট সংখ্যা বর্তমানে ৫ কোটির উপর। এসব পরিবার শুধুমাত্র এক নিদারুণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতাতেই পতিত হয়নি, তাদের সামাজিক অস্তিত্বও আজ বিপন্ন, কারণ আমাদের মত কৃষিভিত্তিক সমাজে জমি হারানো অর্থ শুধুমাত্র জমির মালিকানাটা হারানো নয়, সামাজিক পরিচয়টাও হারানো।

শোষণের বিবিধ ও বিচিত্র রূপ

বাৎসরিক কামলার অনেক নাম—বছর-কামলা, বারোমেসে, মাসমাহিনে, কিষাণ, মুনিষ ইত্যাদি। দিনমজুরেরও অনেক নাম—

২২. "Development Impact of the Food-for-Work program in Bangladesh", BIDS, December, 1985, Introduction.

জন, কামলা, ভাত্‌লা, কিষাণ, ছুটো, পড়েৎ ইত্যাদি। তবে শেক্স-পীয়রের মতই বলতে হয়, নামে কীই-বা আসে যায়! কৃষি-শ্রমিককে আমরা যে নামেই ডাকি, সে—ক্ষেতমজুরই। মজুরী, কাজের চুক্তি ও পরিবেশ, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অঞ্চলভেদে কিছু কিছু পার্থক্য রইলেও যে ক্ষেত্রে কোনোই পার্থক্য নেই, তা' হ'চ্ছে ক্ষেতমজুরদের—মজুরী-শোষণ। মাঝারী কৃষক, ধনী কৃষক বা সরকার, নিয়োগকর্তা যেই হোক না কেন, এই তীব্র মজুরী-শোষণই বাংলা-দেশের তাবৎ ক্ষেতমজুর শ্রেণীকে একটা কাতারে এনে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। সাধারণভাবে ক্ষেতমজুরের মজুরীর দু'টো সুনির্দিষ্টই ধারা রয়েছে, একটা কাজের পরিমাণ অনুযায়ী (Piece-rate), আরেকটা সময়-অনুযায়ী (Time-rate)। শোষণ উভয় ক্ষেত্রেই তীব্র।

যদিও অবক্ষয়ের পথে, তবুও ক্ষেতমজুরদের উপর শোষণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সামন্তবাদী অবশেষসমূহ, যেমন বেগার-প্রথা, সেলামী চুক্তি, রংজমা, চুকানী, ঈশ্বর সেলামী ইত্যাদি রয়েছে এবং বাংলা-দেশের অঞ্চলবিশেষে তা' বেশ প্রকট। রয়েছে আগাম শ্রম বিক্রী, যা একই সঙ্গে সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী এক শোষণ-পদ্ধতি এবং আগাম শ্রম বিক্রীর বিষয়টি বেশ ব্যাপক। শ্রমবাজারে ক্ষেতমজুর যখন বেকায়দায়, তখন তার শ্রম আগাম কিনে নিয়ে মজুরী দেয়া হোল এমন হারে যখন তা' বাজারদরের চেয়ে কম। তাই ক্ষেতমজুর আন্দোলনে এই অপরিহার্য দাবী, 'যখনকার কাম তখনকার দাম'।

জলমহাল, বনমহাল, হাটে-বাজারে ইজারাদারী, এসব সামন্তবাদী অবশেষসমূহের (যা দ্রুতই পুঁজিবাদী ধারায় রূপান্তরিত হচ্ছে), শোষণের প্রত্যক্ষ শিকার ক্ষেতমজুররা। এ ছাড়া রয়েছে অক্টোপাসের বন্ধনের ন্যায় সর্বগ্রাসী মহাজনীপ্রথা। ১৯৩৮ সালে মহাজনী প্রথা বিলোপ ও ঋণ সালিশী স্থাপনের ভেতর দিয়ে মহাজনী শোষণ কিছুটা কমলেও তা' ধ্বংস হয়নি, বরং বেশ দোদণ্ডপ্রতাপ নিয়েই তা আজো বিরাজ করছে। সুদের হার ১০০% থেকে ৩০০%। (৪০০%-ও দেখেছি)। রয়েছে খাই-খালাসী, কট, কট কাওলা, চুক্তি কাওলা ইত্যাদি নানা ধরনের জমি-বন্ধকীর পদ্ধতি। যথার্থ প্রাতিষ্ঠা-

নিক ঋণের অভাবে এভাবেই মহাজনদের খপ্পরে পড়ে ব্যাপক হারে আজকের স্বচ্ছল চাষী প্রথমে বর্গাচাষী ও পরে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়ে চলেছে।

ক্ষেতমজুরদের কোনোই সামাজিক মর্যাদা নেই। মানবিক মর্যাদাও। প্রায়শঃই তাদেরকে তুই-তোকারি করা হয়ে থাকে, তুচ্ছ অপরাধে গালি-গালাজ, লাঠি-পেটা, জুতো-পেটা এসবও জোটে। আর ক্ষেতমজুর পরিবারের শিশুদের শ্রমকে নিয়োগকর্তারা তো প্রায় ফাউ হিসেবেই পেয়ে থাকে এবং ক্ষেতমজুর পরিবারের নারীরা হয়ে থাকে ধনীদের লালসার শিকার।

শ্রম-দাসত্ব (bonded labour) বর্তমানে প্রায় উঠে গেলেও উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর প্রমুখ জেলায় চৌধুরীদের খামারে কিম্বা দক্ষিণ-বাংলার চরাঞ্চলের বড় বড় জোতদারের গৃহে, এখনও, শ্রমদাসত্বের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যায়। তাদের উপর শোষণের মাত্রা ও তীব্রতা প্রায়—মধ্যযুগীয়।

ক্ষেতমজুর সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও রূপ

এটা দুঃখজনক যে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর বৃহত্তম অংশ, নিপীড়িত, নির্যাতিত, সীমাহীন দারিদ্র্যে নিপতিত ক্ষেতমজুর শ্রেণীর মাত্র কয়েক বছর আগেও দেশের রাজনীতিতে কোনো সাংগঠনিক প্রতিনিধিত্ব ছিল না যতদিন পর্যন্ত না বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতি সেই গুরুদায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছে। ক্ষেতমজুরদের বিত্ত নেই, কর্ম নেই, নেই সাংগঠনিক চেতনা, যৌথবোধ ও সামাজিক ভিত্তি। বস্তুতঃ সংখ্যা ছাড়া ক্ষেতমজুরদের আর কোনো শক্তি নেই। তবে সংখ্যাটাই এক প্রচণ্ড শক্তি। এবং সুযোগ্য নেতৃত্ব পেলে আগামী দিনের বাংলাদেশের রাজনীতিতে তারা যে একটা নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠতে পারে, তার কিছু কিছু লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা গেছে। সে কারণেই সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী ও বুদ্ধিজীবীদের এক ব্যাপক অংশের (এবং সাম্রাজ্যবাদেরও!)

আগ্রহ বর্তমানে ক্ষেতমজুরদের সংগঠন ও রাজনৈতিক তৎপরতার প্রতি নিবদ্ধ।

বহু বছর আগেই মার্কস ভূমিহীন-ক্ষেতমজুরদের বিপ্লবী সংগঠন সম্পর্কে এই উক্তি করে গিয়েছিলেন, "...লক্ষ লক্ষ পরিবারের জীবনের এমন অর্থনৈতিক অবস্থায়, যেখানে তারা তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী, তাদের স্বার্থ এবং তাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্যান্য শ্রেণীর ঐসব উপাদান থেকে স্বতন্ত্র এবং রয়েছে শোষকদের প্রতি বৈর-বিরুদ্ধ অবস্থানে—এই দিক থেকে তারা একটি শ্রেণী বটে ... কিন্তু পরস্পর সংযুক্তি যে পরিমাণে স্থানীয় মাত্র এবং স্বার্থের অভিন্নতা তাদের মধ্যে পয়দা করে না কোন যৌথসত্তা, জাতীয় পরিসরের বন্ধন, রাজনৈতিক সংগঠন, সেই পরিমাণে তারা শ্রেণী নয়। ... কাজেই তারা নিজেদের নামে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ...জোর দিয়ে তুলে ধরতে অপারগ, তারা নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, তাদের হয়ে কাউকে প্রতিনিধিত্ব করা চাই।"[২৩]

১৯৮০ সালে তার জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতি ঠিক এই কাজটিই করে আসছে। এদেশের ঐতিহ্যবাহী কৃষক আন্দোলন তেভাগা, টঙ্ক, নানকার আন্দোলনের ঐতিহ্যকে ধারণ ও তার পথ বেয়েই এক ঐতিহাসিক অনিবার্যতা—বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতি।

ক্ষেতমজুরের উপর শোষণ : সামন্ত-অবশেষ না পুঁজিবাদী ?

এদেশের বামমহলে এটা একসময় জোর বিতর্কের বিষয় ছিল যে কৃষি অর্থনীতিতে শ্রমের সঙ্গে মূল দ্বন্দ্বটা কার সঙ্গে—সামন্তবাদী অবশেষসমূহের না ক্রমজায়মান পুঁজিবাদী ধারার। মার্কসবাদের ছাত্র মাত্রেই জানেন যে উৎপাদন-পদ্ধতির এই মূল দ্বন্দ্বটি নির্ধারণের ব্যাপারটি বিপ্লবী রাজনীতিতে কতখানি জরুরী। এক্ষেত্রে চুল

২৩. মার্কস-এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনা-সংকলন, খণ্ড-৪, পৃ—১২১-২২।

পরিমাণ ভুল গোটা কর্মকাণ্ডকেই মিস্‌ফায়ার করে দিতে পারে, এমনকি কোন অপ্রধান দ্বন্দ্বকে মূল দ্বন্দ্ব হিসেবে ধরে লাইন ঠিক করলে কোনো বামদল নিজের অজান্তেই প্রতিক্রিয়ার পক্ষে কাজ করে ফেলতে পারে, যে উদাহরণ আমাদের দেশের অনেক মাওবাদী দলের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি। তবে পাশাপাশি একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবি এই উৎপাদন-পদ্ধতি (mode of production) বিতর্ককে যেভাবে একটি অর্থহীন কূটকচালে (scholastic) একাডেমিক বিতর্কে পরিণত করেছে, তা এড়িয়ে আমরা মূলতঃ ক্ষেতমজুর শ্রেণীর স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকেই উৎপাদন-পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব।

প্রথমে এ ব্যাপারে সামন্তবাদের লক্ষণগুলি চিহ্নিত করা যাক্।

বাংলার গ্রামাঞ্চলের ইতিহাসে ইউরোপের ফিউডালিজমের মত শ্রম-খাজনার (labour rent) তেমন চল ছিল না। তবে জমিদার-জোতদার ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের জন্য বেগার খাটার প্রচলন ছিল। শ্রমদাসত্ব বা bonded labour ছিল, যার কিছু কিছু অবশেষাংশ এখনও লক্ষ্য করা যায় (যেমন হাওড় বা দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকায় বড় জোতদারের গৃহে কিম্বা উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরে চৌধুরীদের বাড়ীতে বংশানুক্রমে আবদ্ধ ক্ষেতমজুর), তবে এ প্রথা দ্রুত অবলুপ্তির পথে।

বস্তুতঃ সামন্তবাদের যে দু'টি মূল অবশেষ আমাদের এখানে বিদ্যমান, তা' হ'চ্ছে—মহাজনী প্রথা ও বর্গাপ্রথা। এছাড়া থাকছে জমির মালিকের সঙ্গে ক্ষেতমজুরের দাতা-গ্রহীতা (client-patron) সম্পর্ক, আত্মীয়তা এবং ধর্ম, গোত্র ও অন্যান্য উপরিকাঠামোগত সাংস্কৃতিক প্রভাব। এটা মনে রাখতে হবে যে ক্ষেতমজুরদের উপর শোষণের ব্যাপারে সামন্তবাদের অবশেষসমূহের ক্ষেত্রে অর্থনীতি-বহির্ভূত শক্তিগুলি, যা মার্কসের ভাষায় "juridico—political" বা "customary" ইত্যাদির ভূমিকাও কম নয় যে ধরণের শোষণকে মার্কস বলছেন "extra-economic coercion"।

এটা সত্য যে পুঁজি, তা যদি মহাজনী পুঁজিও হয়, তবে তার গতিশীলতার কারণেই সে সামন্তবাদের বিপরীতে অবস্থান নিতে

পারে। মার্কসও মহাজনী পুঁজির সামন্তবাদবিরোধী ভূমিকা মেনে নিচ্ছেন শুধুমাত্র সেইসব ক্ষেত্রে যখন ধনী-ভূ-স্বামীরা ঋণ গ্রহণ করে।[২৪] কিন্তু আমাদের এখানে ব্যাপারটা প্রায় উল্টো। এখানে ধনী ভূ-স্বামীরাই মহাজন। ফলে "মহাজনী পুঁজি" তেমনভাবে সামন্তবাদ বিরোধী নয়। বরং মহাজনীপ্রথা সামন্তপ্রভুদের হাতে আরো সম্পত্তি কেন্দ্রীভবনের হাতিয়ার হিসেবে থেকেছে। পরবর্তীতে আমরা দেখাতে চেষ্টা করব যে কৃষি-ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রামাঞ্চলে মহাজন-সামন্তপ্রভূদের এই ক্ষমতা কতখানি হ্রাস করতে পেরেছে, বা আদৌ পেরেছে কি ?

এ প্রসঙ্গে বরং সামন্তবাদের অপর অনুষঙ্গ বর্গাপ্রথা দাবী করে আরো বিশদ আলোচনা। ১৯৮৩ সালের জানুয়ারীতে "ভূমি সংস্কার কমিটির রিপোর্ট"—এর উপাত্ত অনুযায়ী দেশের মোট কৃষকের ৩৮·৪৮% বর্গাচাষী এবং গ্রামাঞ্চলের চাষকৃত ৪৩% জমি বর্গাচাষের অধীন। যদিও এই পরিসংখ্যান পুরোপুরি প্রশ্নাতীত নয়।

জমির মালিক একাধিক কারণে বর্গা চাইতে পারেন। সাধারণভাবে ফসলের দাম কম থাকলে জমি বর্গা দেয়াই জমির মালিকরা বেশি লাভজনক মনে করে। কিন্তু ফসলের দাম বেশি হলে আবার ক্ষেতমজুর নিয়োগ করে নিজের অধীনে আবাদের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া জমিতে মজুরী শ্রমিক নিয়োগ করে চাষ করলে যে খরচ হয় তার চেয়ে বর্গাপ্রথার মাধ্যমে শ্রম নিয়োগে খরচ কম পড়ে। কারণ ক্ষেতমজুর শুধু দেয় শ্রম। বর্গাচাষী দেয় শ্রম ও কৃষির উপকরণ। তাছাড়া ক্ষুদে বর্গাচাষী প্রাণান্ত পরিশ্রম করে বা বিনামূল্যে পারিবারিক শ্রম নিয়োগ করে। এধরণের বর্গাচাষপ্রথা নিঃসন্দেহে ক্ষেতমজুরের কর্মসংস্থান কমায়।

আরেকটি কারণেও মালিক বর্গা চাইতে পারে। তা' হ'চ্ছে বর্গাচাষে দৈনিক শ্রম ক্রয়ের ঝামেলা থাকে না বলে শ্রম সরবরাহ সুনিশ্চিত থাকে। তাই শুধু তাত্ত্বিক কারণে নয়, ক্ষেতমজুরের নিজের

২৪. কার্ল মার্কস, পুঁজি, পৃ—৫১৩-৫১৪।

কাজ পাওয়া ও মজুরী নিয়ে দর কষাকষির অধিকার পেতেও বর্গাপ্রথার বিরোধিতার প্রয়োজন।

তবে বর্গাপ্রথার মধ্যে গরীব কৃষকের যেটুকু স্বার্থ রয়েছে, একটি শ্রেণী হিসেবে ক্ষেতমজুর শ্রেণী তা' রক্ষায় আগ্রহী। কারণ সে চায় না বর্গাজমি হারিয়ে আরো আরো গরীব চাষী তার কাতারে এসে শ্রমবাজারে ভীড় করুক। তার মজুরী কমাক। সে কারণেই ক্ষেত-মজুর সমিতিরও দাবী স্থায়ী বর্গাসত্ব ও তেভাগা কায়েম।

তবে পাশাপাশি যেহেতু বর্গাপ্রথায় পুঁজিবাদ দ্রুতই অনুপ্রবেশ করছে তাই এর নেতিবাচক দিকটি সম্পর্কেও ক্ষেতমজুর শ্রেণীর সচেতন থাকা প্রয়োজন। লেনিন একদিন নারোদনিকদের যুক্তি খণ্ডন করে বলেছিলেন ও রাশিয়ার ক্ষেত্রে প্রমাণ করে ছেড়েছেন যে শ্রমখাজনার বিভিন্ন রূপটি ধনবাদী রূপে পরিণত হতে পারে। আমাদের বর্গাপ্রথার ক্ষেত্রে আজকে সেরকমই যেন হ'চ্ছে। একদিন বর্গাচাষীরা স্বচ্ছল কৃষক ছিল। আজ বর্গাচাষীর আর্থিক অবস্থার এতই অবনতি ঘটেছে যে সে জমির মালিকের সঙ্গে দরকষাকষির তেমন শক্তি পায় না। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ও জলসেচের সুবিধার ফলে সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে অনেকসময়ই ধনী চাষী বর্গাচাষে প্রদত্ত জমি মজুর দিয়ে স্বচাষে আনতে আগ্রহী হচ্ছে। বর্তমান সরকারের বহুল বিজ্ঞপিত পাঁচ বছরের বর্গাস্বত্ব আইন যে দুর্বল বর্গাচাষীর তেমন কোনো কাজে আসেনি, তা' অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। এই আইন হওয়ার আগে-পরে জমির মালিকেরা বহু বর্গাচাষীকে জমি থেকে ছুটিয়ে দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে। কৃষি-উপকরণ ও কৃষি-পণ্যের বাজার-ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে এককালের সামন্ত-বাদী প্রথা বর্গা আজ প্রায় পুঁজিবাদী এক সম্পর্কে পরিণত হ'চ্ছে। ফসলের বদলে নগদ অর্থ ও উল্টো বর্গাও দেখা যাচ্ছে। সে কারণেই বোধহয় বর্তমান এরশাদ সরকারের মত একটি আমলা-মুৎসুদ্দী পুঁজির সরকারও "বর্গাচাষীর স্বার্থরক্ষা"-র (!) কথা বলতে পারে। সে লক্ষ্যে আইন করতেও পারে !!

আর বর্গাপ্রথার প্রতি ক্ষেতমজুর আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণ-

ভাবে হবে—দ্বান্দ্বিক। একদিকে গরীব চাষী যাতে বর্গার জমি হারিয়ে শ্রমবাজারে না এসে দাঁড়ায় এটা যেমন দেখার রয়েছে, তেমনই এটাও দেখবার রয়েছে যে ক্ষুদে বর্গাচাষীরা ক্ষেতমজুর নিয়োগ করতে পারে না বিধায় ক্ষেতমজুরের কর্মসংস্থানের সুযোগও কমছে এবং সামগ্রিকভাবে তা' কৃষির উৎপাদিকা-শক্তির বিকাশেরও অনুকূল হ'চ্ছে না। ক্ষেতমজুরের মজুরী বৃদ্ধির দাবী উঠলে নিয়োগকর্তা বর্গাচাষীর সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হবেই। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এদেশে যে সব কৃষি-আন্দোলন হয়েছে, তা' মূলতঃ হয়েছিল বর্গাদার-দের স্বার্থে। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে তাতে সাফল্য আসেনি। কৃষি-উৎপাদনের সবচে' বেশী সর্বহারা ও জঙ্গী শ্রেণী ক্ষেতমজুর শ্রেণীকে ভিত্তি না ধরে যে কোনো বৈপ্লবিক কৃষি-আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে মূল দাবী, অনিবার্যভাবেই হয়ে উঠবে ক্ষেত-মজুরদের কর্মসংস্থান, আমূল বৈপ্লবিক ভূমি সংস্কার ও সমবায়।

তবে গ্রামীণ একটা অ-ধনিক শ্রেণী এই বর্গাদারদের স্বার্থটাও হয়তো দেখা প্রয়োজন, যখন আমরা বুঝতে পারছি যে আগামী বেশ দীর্ঘদিনই এই শ্রেণীটি আমাদের কৃষি-উৎপাদনে জড়িয়ে থাকবেই, তা' কৃষিতে ধনবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের অনুপ্রবেশ যত দ্রুত ও তীব্রই হোক না কেন। এদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে একটা কার্যকরী পদক্ষেপের উদাহরণ আমরা আমাদের কাছাকাছির মধ্যে দেখেছি পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট সরকার কর্তৃক গৃহীত "অপারেশন বর্গা"-র মধ্যে (যেখানে জমির মালিককেই যে প্রমাণ করতে হবে যে বর্গাচাষী তার বর্গাদার নয়, এটা নিঃসন্দেহে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ), এবং, কার্যকরভাবে তেভাগা প্রদানের ব্যবস্থার মধ্যে।

ভূমি-সংস্কার কমিটির রিপোর্ট, বিড়ালের পিঠাভাগ ও সরকারের শ্রেণী-চরিত্র প্রসঙ্গে

এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটটি মনে রেখেই আমরা এখন ১৯৮৪ সালে বর্তমান সামরিক সরকার যে ভূমি-সংস্কারের ঘোষণা দিয়েছে, তার

একটা পর্যালোচনা করতে চাই। কিন্তু তার আগে আমরা আমাদের দেশের জমির মালিকানার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

১৯৭৭ সালে বাংলাদেশে মোট জমির মালিকানার চিত্র

একর	মোট পরিবারে ভাগ	মোট জমির ভাগ	মোট জমির মালিকানার ভাগ একর
শূন্য	১১'০৭	৮'২৮	×
০'০১—১'০০	৪৭'৪৪	৪২'৩৩	৯'৩৯
১'০১—২'০০	১৬'৪৩	১৬'৭৮	১৪'৪৩
২'০১—৩'০০	৮'৯১	৯'৮৬	১৩'১৮
৩'০১—৪'০০	৫'২৭	৬'৪৮	১১'১৩
৪'০১—৫'০০	৩'২৯	৪'২৫	৯'০০
৫'০১—৬'০০	২'০৯	২'৯৬	৬'৯০
৬'০১—৭'০০	১'৪৩	২'০৯	৫'৬৯
৭'০১—৮'০০	১'০২	১'৫৭	৪'৬৫
৮'০১—৯'০০	০'৬৯	১'০৭	৩'৬০
৯'০১—১০'০০	০'৪২	০'৬২	২'৪৬
১০'০১—১১'০০	০'৩৪	০'৫৪	২'৪৬
১১'০১—১২'০০	০'২৯	০'৫২	২'০৩
১২'০০—১৩'০০	০'১৬	০'২৬	১'১৬
১৩'০০—১৪'০০	০'২২	০'৩৯	১'৮২
১৪'০১—১৫'০০	০'১৩	০'২৮	১'১৯
১৫ একরের উর্ধ্বে	০'৮০	১'৬৩	১১'২৯[২৫]

২৫. উৎস: বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্টাটিস্টিক্স।

এই সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় ৫৯ ভাগ পরিবার মোট আবাদী জমির মাত্র ৯'৩০ ভাগের মালিক। অন্যদিকে শতকরা

মাত্র ৫'৫০ ভাগ পরিবারের অধীনে আবাদী জমির পরিমাণ ৩৬'৫৪। এই দৃষ্টিকটু বৈসাদৃশ্য ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য করে তুলেছে। এমনকি বর্তমান আমলা-মুৎসুদ্দী সরকারের পক্ষেও!

এখন ভূমি-সংস্কার, তা' সে প্রজাস্বত্বমূলক, পুঁজিবাদী কিম্বা সমাজতান্ত্রিক যাই হোক না কেন, তা' মূলতঃ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কারণ তা' রাজনৈতিক কাঠামোকে প্রভাবিত করবেই। সেদিক থেকে রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা আসীন তাদের সৃষ্ট ভূমি-সংস্কারের স্বরূপ মূল্যায়ণ করলে আমরা একই সঙ্গে তাদের শ্রেণীচরিত্র, এবং, কৃষিতে সামন্ত-বাদের অবশেষ, না পুঁজিবাদী ধারাসমূহ অধিকতর তীব্র হ'চ্ছে, তারও একটা পরিচয় পেতে পারি।

কিভাবে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন রাজনৈতিক দলের শ্রেণীগত দৃষ্টি-ভঙ্গী দ্বারা ভূমি-সংস্কারের বিষয়টি প্রভাবিত হয়, তার একটি উল্লেখ-যোগ্য উদাহরণ বাংলাদেশে সর্বদাই হয়ে রইবে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকার কর্তৃক ১০০ বিঘা সিলিং-এর ঘোষণা ও পরে নিজের দলের ভেতরকার জোতদারদের চাপ ও প্রগতিশীলদের পক্ষে শিলিং কার্যকরী করার মত সংগঠন ও আন্দোলনের অনুপস্থিতির ফলে পরিবারের সংজ্ঞা পাল্টানোর ঘটনাটি। অনেক ঢাক্-ঢোল পিটিয়ে ১৯৮২-এর ২৯শে জুলাই তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী ওবায়দুল্লাহ্ খানের নেতৃত্বে এরশাদ সরকার ৮-সদস্য বিশিষ্ট ভূমি-সংস্কার কমিটি গঠন করলেও এ সরকারের কৃষক-ক্ষেতমজুর স্বার্থ-বিরোধী চরিত্রটা প্রথমেই ফুটে ওঠে যখন দেখি যে সেই কমিটিতে কোনো কৃষক বা ক্ষেতমজুর প্রতিনিধি নেই! বরং রয়েছে এদেশে ব্যক্তিপুঁজির বিশেষ ধারক-বাহক "ইত্তেফাক" গোষ্ঠীর অন্যতম মালিক!! কমিটি কর্তৃক যে "ভূমি-সংস্কার অধ্যাদেশ" (১৯৮৪ সালের ২৪শে জানুয়ারী, অধ্যাদেশ নং ১০/১৯৮৪) ঘোষিত হয় তা' যে বিশ্বব্যাঙ্কের মডেল ও চাপ অনুযায়ীই করা হয়েছে সেটা নতুন কোনো তথ্য নয়। এতে ৬০ বিঘার অতিরিক্ত জমি ক্রয় করা নিষিদ্ধ করা হলেও যাদের ইতিমধ্যে ৬০ বিঘার উর্ধ্বে জমি রয়েছে সে উদ্বৃত্ত জমি খাস করার ব্যাপারে কোনো কথা নেই!

তবে ভূমি-সংস্কারের নামে সবচে বড় ভণ্ডামিটা হয়েছে বর্গাপ্রথার ক্ষেত্রে। অধ্যাদেশে বলা হয়েছে যে ১৯৮২ সালের ২৬শে মার্চ পর্যন্ত কর্মরত বর্গাচাষীদের ৫ বছরের বর্গাস্বত্ব প্রদান করা হবে। বাস্তবে যেহেতু জোতদাররা রাজধানীসহ সরকারের উচ্চমহলের মতিগতির খোঁজ-খবর কিছুটা রাখে (যেটা মোটেই রাখে না গরীব ও অশিক্ষিত বর্গাচাষী), ফলে দেখি ওই তারিখের আগে ও পরে, ব্যাপকহারে বর্গচাষীদের, যাদের স্বার্থরক্ষার কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অধ্যাদেশে ছিল না, উচ্ছেদ করা হো'ল এবং এখনও হ'চ্ছে।

বলা হ'চ্ছে জমির মালিক যদি কৃষি উপকরণের (বীজ, সার, পানি, তেল) প্রদান করে তা'হলে জমির মালিক দুই-তৃতীয়াংশ ফসল পাবে। এবং অত্যন্ত সুকৌশলে এই কৃষি-উপকরণের মাঝে কৃষি-উৎপাদনের যে উপকরণ সেই লাঙ্গল-গরুকেই ধরা হয়নি, যে লাঙ্গল-গরু সর্বদাই বর্গাচাষীই সরবরাহ করে থাকে। ফলে এক ধরণের "উল্টো তেভাগা" লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং এতে জোতদাররাই উপকৃত হ'চ্ছে।

অপত্তনযোগ্য খাস জমি যেমন খাল, ডোবা, এজমালী কবরস্থান, শ্মশান, রাস্তাঘাট, জনসাধারণের মাঠ, ঈদগাহ, গোপাট, গোচারণ-ভূমি—ইত্যাদি সরেজমিনে তদন্ত করে পত্তন দেয়ার যে কথা বলা হয়েছে তাও বাস্তবসম্মত নয় কারণ ইতিমধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই এসব জমি কর্ষিত হ'চ্ছে ও ব্যক্তি-বিশেষের বেআইনী অথচ প্রকৃত দখলে চলে গেছে।

কমিশনের রিপোর্টে অনূর্ধ ৩ মাসের মধ্যে জরীপ কাজ শেষ করা ও জরীপ শেষ হওয়ার ৩ মাসের মধ্যে খাস জমি ভূমিহীনদের দেয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে উরির চর সরকারী মানচিত্রেই ছিল না। আর ক্ষেতমজুরদের নয়, খাস-জমি দেয়া হ'চ্ছে—ফেণী নদীর মোহনায় এক সন্দেহজনক বিদেশী সাহায্য-সংস্থাকে, চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায়—জনৈক আরবের শেখকে!! আর রেডিও-টিভিতে বহু ঢাকঢোল পিটিয়ে এরশাদ সরকার সুনামগঞ্জ সহ অন্যান্য জায়গায় যে কয়েক ডজন ভূমিহীন পরিবারকে সম্প্রতি খাস জমি দিয়েছেন, তা'

যে মূলতঃ টেলিভিশন ক্যামেরার জন্য করা হয়েছে, সেই হাস্যকর প্রয়াসের উল্লেখ আর নাই-বা করলাম। সরকার কর্তৃক ক্ষেতমজুরদের সাড়ে তিন সের চাউলের সমান মজুরীর আইন ও অতি-সম্প্রতি সরকার ভূমিহীনদের খাস জমি বিতরণের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সে সম্পর্কে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

এছাড়া কমিটি নাকি ওয়াকফ ও দেবোওর জমি এবং অর্পিত জমির সমস্যাদি সময়াভাবে পেরে ওঠেননি। কমিটি "ব্যক্তিমালিকানায় বৃহদাকার খামারের সম্প্রসারণ প্রগতিশীল কর আরোপের মাধ্যমে নিরুৎসাহিত করা"-র যে কথা বলেছে তার বুর্জোয়া চরিত্র বাদ দিলেও বলা যায় যে, এ এক অবাস্তব সুপারিশ। ফলতঃ এক হাতে জমি কেন্দ্রীভূত হওয়ার বর্তমান প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে, এবং এর বিপরীতে—নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়াও।

বস্তুতঃ সামরিক সরকার কর্তৃক ঘোষিত ভূমি-সংস্কার অধ্যাদেশ মূলতঃ একটি পুঁজিবাদ-অভিমুখীন পদক্ষেপ যা এ ধরনের একটি মুৎসুদ্দী সরকারের (তা' সামরিক ও বেসামরিক যেরকম লেবাসেই হোক না কেন) স্বাভাবিক শ্রেণী চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। নেপথ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাঙ্ক তথা সাম্রাজ্যবাদ। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ভূমি-সংস্কারে সাম্রাজ্যবাদের কি লাভ? কেন সে তা' চাইবে?

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে জমির পরিমাণ যেসব পরিবারের বেশী, তাদের একর প্রতি উৎপাদনশীলতা যাদের জমির মালিকানা কম তাদের তুলনায় নীচু। আবার বর্গা জমির উৎপাদনশীলতা একই কৃষকের নিজ জমির উৎপাদনশীলতার তুলনায় কম। এসব কারণে সাম্রাজ্যবাদ ভূমি-সংস্কার চাইতে পারে। তাছাড়া, খুব বড় জোতের চেয়ে মাঝারি জোতের কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে ঝোঁক বেশী। তাই ভূমি-সংস্কারের মাধ্যমে এই শ্রেণীর হাতে জমি পৌছনো সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য হতে পারে। যাতে উফশী চাষ বাড়ে। বাড়ে সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ বিক্রীর বাজার। উৎপাদন বাড়লে, বাজার বাড়বে, শুধু কৃষি উপকরণের নয়, ভোগ্যপণ্যেরও, যেসব পণ্য

সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশে বেচতে চায়।

অবশ্য পাশাপাশি এটাও সত্য যে গত কয়েক বছরে দ্রুত নিঃস্ব-করণ প্রক্রিয়ার ফলে গ্রামাঞ্চলে যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং বিগত কয়েক বছরে ক্ষেতমজুর আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট ক্ষেত-মজুরদের চেতনাকেও সরকারকে হিসেবে রাখতে হ'চ্ছে। ফলে তার সুর নরম এবং ভূমিহীনদের স্বার্থে ইদানীং রেডিও-টেলিভিশনে বিস্তর কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করা হচ্ছে। কিন্তু যেটা কৌতূহলোদ্দীপক যে এদেশে ব্যক্তি-পুঁজির মূল প্রবক্তা "ইত্তেফাক" পত্রিকার মালিক, ও ভূমি-সংস্কার কমিটির অন্যতম সদস্যকে আবার দেখছি জমির মালি-নার উপর সিলিং আরোপের বিরোধিতা করতে! আমাদের দেশের মুৎসুদ্দী বুর্জোয়াদের নগদ স্বার্থজ্ঞানটা টনটনে। বিশ্বব্যাঙ্কের মত "কমিউনিস্ট বিপ্লব"-এর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আশঙ্কায় এরা ভোগে না! এরা শুধু তাৎক্ষণিক সুবিধাটা নিতেই ব্যস্ত!

এবং সে কারণেই হয়তো দেখি দেশী-বিদেশী নানা চাপের মুখে, অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে, ভূমি-সংস্কার কমিশনের রিপোর্টের যে অংশটুকু অধ্যাদেশ হিসেবে গৃহীত হয়েছে, তা'ও আমলা-মুৎসুদ্দী পাওয়ার লবিগুলি ও তাদের গ্রামের দোসররা কার্যকর হতে দিচ্ছে না। আর এটাতো সাধারণ জ্ঞানের কথা যে ভূমি-সংস্কার মানে যদি শুধু জমির পুনর্বণ্টন হয়ে থাকে, তবে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রশাসনিক কাঠামোরও উপযুক্ত পরিবর্তন না করা হয়। প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গে ভূমি-সংস্কারের আপেক্ষিক সাফল্যের এক বড় কারণ হ'চ্ছে ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর সঙ্গে ওদের জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গ্রামীণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার রাজনৈতিক সমন্বয়।

কৃষিতে ধনবাদের লক্ষণসমূহ প্রসঙ্গে

গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ কতখানি ব্যাপ্তি ও গভীরতা পেয়েছে তার এক বড় মাপকাঠি হতে পারে ক্ষেতমজুরদের শ্রমশক্তি কতখানি "মুক্ত" (free) বা "অ-মুক্ত" (unfree)?

কতখানি তা পুঁজিবাদী পণ্যে রূপান্তরিত? ক্ষেতমজুরের শ্রমশক্তি এখনও পুরোপুরি পুঁজিবাদী এক পণ্য হয়ে উঠেছে একথা নির্দ্বিধায় বলা কঠিন কারণ এখনও তার সুনির্দিষ্ট বাজারমূল্য পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি। তবে এটাও সত্য যে বিগত দুই দশকে ক্ষেতমজুরদের শ্রমশক্তি দ্রুতই পুঁজিবাদী এক পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে, হ'চ্ছে। ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক সামন্ত-অবশেষসমূহকে নেতিকরণ করছে।

পুঁজিবাদের বিকাশের দু'টো পূর্বশর্ত। এক, অর্থনীতিতে পুঁজির সঞ্চালন ও দ্বিতীয়টি, ব্যাপক এক সর্বহারা জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি যাদের শ্রম ছাড়া বেচার আর কিছু নেই। মার্কসের ভাষায়, "যখন বিশাল জনগোষ্ঠীকে তাদের জীবিকার উপায় থেকে অকস্মাৎ সবলে বঞ্চিত করে সকল রকম বন্ধনমুক্ত ও 'সংযোগহীন' অবস্থায় সর্বহারায় পরিণত করে শ্রমবাজারে নিক্ষেপ করে।"[২৬] পুঁজিবাদের বিকাশের জন্য তাই অন্যতম প্রয়োজন মজুরী-শ্রমিক। কিন্তু কৃষিতে যারা মজুরী করতে পারে, সেই গরীব কৃষক তো জমিতে বাঁধা। তাই প্রয়োজন জমির মালিকানা থেকে গরীব কৃষককে বিচ্যুত করা। জমি থেকে উচ্ছেদ করে তাকে শ্রমবাজারে ক্ষেতমজুর হিসেবে নিযুক্ত করা। ঠিক যে কাজটিই বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী গৃহীত আমাদের সরকারগুলোর কৃষিনীতির মাধ্যমে বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ঘটে চলেছে, যে কারণে আজ ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সংখ্যা শতকরা ষাট ছুঁই ছুঁই, যাদের শ্রম ছাড়া আর কিছু বিক্রীর নেই।

তবে ক্ষেতমজুরের শ্রমশক্তি এখনো যে পুরোদস্তুর পুঁজিবাদ বাজার-অর্থনীতির হিসাবে পড়েনি, অর্থাৎ এখনও যে তার শ্রমশক্তি পুরোপুরি পুঁজিবাদী এক পণ্য হয়ে উঠতে পারেনি, তার লক্ষণ হিসাবে এমন ঘটনা দেখেছি যে পাশের গাঁয়ে মজুরী কিছুটা বেশী থাকলেও সে নিজের গাঁয়ের মালিকের জমিতে কাজ করছে। কেন? জবাবে বলেছে, বাঁধা কাজ, যাতে ফী-বছর কাজ পাই। জমির মালিকের যাতে তার উপর আস্থা থাকে। এই মালিকের জমি তাকে কাজ দেয়ার জন্যে সংরক্ষিত। ফলে এক ব্যাপক অংশ ক্ষেত-

২৬. কার্ল মার্কস, "পুঁজি" পৃ—৭৮৭।

মজুরই এখনও মার্কস কথিত সেই পুরোপুরি "সংযোগহীন" হয়ে শ্রমবাজারে নিক্ষিপ্ত হয়নি। তবে প্রবণতাটা সেদিকেই।

আবার এমনও দেখেছি যে একই গাঁয়ে দুই রকম মজুরীতে কাজ করছে। জিজ্ঞেস করলে বলেছে, আসগর শেখ বেশী দিবার পারে। ধনী লোক। কিন্তু তোরাব আলী দেবে কোত্থেকে! ও ও-তো গরীব! এ-ধরণের কিছু বিবেচনাবোধ প্রমাণ করে যে ক্ষেতমজুরের শ্রম পুরোপুরি বাজার-অর্থনীতির পুঁজিবাদী একটি পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে ওঠেনি।

আবার বিপরীত ঝোঁকগুলোও বিদ্যমান। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে ক্ষেতমজুররা দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে কাজে বেশী আগ্রহী। মজুরীর আর্থিক দিক ছাড়াও কোনো একক মালিকের উপর নির্ভর না থাকার স্বাধীনতাটা এতে পাওয়া যায়। এ ঝোঁক নিঃসন্দেহে পুঁজিবাদ-অভিমুখীন।

যদিও এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে কৃষিতে পুঁজির-চেয়ে শ্রমের ভূমিকাই বেশী তবুও শ্রম কৃষিতে উৎপাদনের একটি অনুষঙ্গ মাত্র। এ ছাড়া রইছে জমি, সার, বীজ, পানি ইত্যাদি উপকরণ। সে সব ক্ষেত্রেই বা অবস্থা কি? এখানেও আমরা দেখি যে ব্যক্তিমালিকানাধীন উচ্চ ফলনশীল বীজ, সেচ ও সারের সাহায্যে আবাদ অর্থাৎ পুঁজিঘন আবাদই সরকারের কৃষি-উন্নয়নের মূল কৌশল এবং আইউব খানের "সবুজ বিপ্লব" (!) থেকে এই প্রক্রিয়াই চলে আসছে।

কিন্তু উপকরণগত ক্ষেত্রে কৃষি-উৎপাদনের উপকরণের সত্যি কি কোনো মৌলিক পরিবর্তন এসেছে? অনাদিকাল থেকে চলে-আসা আমাদের কৃষি-উৎপাদনের মূল প্রযুক্তি সাড়ে নয় ইঞ্চি লাঙ্গলের ফলা কি আজও সেই সাড়ে নয় ইঞ্চিই রয়ে যায়নি? পেছনে হাড়-জিরজিরে দুই গরু ও এক মানুষ? যান্ত্রিক চাষাবাদ তো আজও এক স্বপ্ন। আধুনিকায়ন যা ঘটেছে তা' ঘটেছে মূলতঃ জলসেচ, সার, কীটনাশক ঔষধ ও উচ্চফলনশীল বীজ ব্যাবহারের ক্ষেত্রে। আর এ সবগুলিরই কারণ বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজার-ব্যবস্থা বা সাম্রাজ্যবাদ যেসব জিনিষ এদেশে বেচতে চেয়েছে। বিষয়গুলি একটি একটি

খামারের আয়তন	মোট সংখ্যা	শ্রমের ধরণ					
		পরিবারের লোক দ্বারা		পরিবারের লোক ও মজুর		মজুর দ্বারা	
		সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
সকল কৃষি খামার	৬,৮৫২,৫৫৮	৩,৭৮২,৩৭৩	৫৫'২	২৬৩৮৩৫৯	৩৮'৪	৪৩১৮২৬	৬'৩
০'৫ একরের নীচে	৩,৪২,০৪০	২৮৩১৭৭	৮২'৮	৪২৫২৫	১২'৪	১৬৩৩৮	৫'৮
১'০ একর থেকে ১'৫ একরের নীচে	৭৯৯২৮২	৫২৯৬৯৩	৬৬'৩	২২৯৯৪৩	২৮'৮	৩৯৬৪৬	৫'০
২'৫ একর থেকে ৫'০ একরের নীচে	১৮২৯৪৫৮	৮২৮৪৪৬	৪৫'৩	৮৯৫২৮	৪৯'০	১০৪৪৮৪	৫'৭
৫'০ একর থেকে ৭'৫ একর	৭২৬২৭২	২৩০১৫৮	৩১'৭	৪৩০৩১৩	৫৯'২	৬৫৮০১	৯'১
৭'৫ একর থেকে ১০'০ একর	২৬৯২৯৬	৬১৮৭৮	২৩'০	১৭৪১৫৭	৬৪'৭	৩৩২৬১	১২'৪
১০'০ একর থেকে ১২'৫ একর	১৪০৭৯৬	২৫৫০২	১৮'১	৯১৪২০	৬৪'৯	২৩৮৭৪	১৭'০
১২'৫ একর থেকে ১৫'০ একর	৬২৯০১	৯৫৭৪	১৫'২	৪১৪৬৯	৬৫'৯	১১৮৫৮	১৮'৯
১৫'০ একর থেকে ২৫'০ একর	৯৩৩৫৭	১০৮৭৮	১১'৭	৫৮৮৩৭	৬৩'০	২৩৬৪২	২৫'৩
২৫'০ একর ও তদূর্ধ্ব	২৩২১১	২০৬৩	৮'৯	১২৭৭১	৫৫'০	৮৩৭৭	৩৬'১ (২৭)

২৭. কৃষি শুমারী, ১৯৭৭। উদ্ধৃত, অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ—৪৩।

করে পর্যালোচনা করা যাক্।

যেহেতু আমাদের দেশের কৃষিতে যন্ত্রায়ন সীমাবদ্ধ এবং হাল-লাঙ্গল নিয়ে চাষই মূল ব্যাপার, ফলে কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশের লক্ষণের ক্ষেত্রে, আবাদের ক্ষেত্রে, কৃষি-মজুর নিয়োগের প্রশ্নটি একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ। সেকারণে পুঁজিবাদের লক্ষণসমূহ চিহ্নিত করতে গিয়ে আমরা প্রথমেই জমির মালিকানার ধরন ও ক্ষেতমজুর নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে কিছু বলতে চাই।

জমির মালিকানার ধরণ ও ক্ষেতমজুর নিয়োগের পরিমাণ

এ প্রসঙ্গে আলোচনা শুরুর আগে আমরা ১৯৭৭ সালে এদেশে পারিবারিক শ্রম অথবা ক্ষেতমজুর দ্বারা চাষাবাদ সম্পর্কিত একটা পরিসংখ্যান পূর্বের পাতায় তুলে ধরছি।

পরিসংখ্যানে দেখা যায় খামারের আয়তন অনুযায়ী ক্ষেতমজুর নিয়োগের রড় রকম হেরফের হয়। জমির পরিমাণ যত বাড়ে ক্ষেত-মজুর নিয়োগের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পায়। এ সম্পর্কিত আরেকটি পরিসংখ্যান দিলে হয়তো বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে।

খামারের আয়তন ও শ্রম ব্যবহারের ধরণ

খামারের আয়তন (একরে)	পারিবারিক শ্রম	ভাড়া করা শ্রম
০.১ —০.৯৯	৮৪.৩৮	১৫.৬২
১.০০—১.৯৯	৮১.১৯	১৮.৮১
২.০০—২.৯৯	৭৪.৭৭	২৫.২৩
৩.০০—৩.৯৯	৬৬.০৫	৩৩.৯৫
৪.০০— ৪.৯৯	৬৫.১০	৩৪.৯০
৫.০০ ও উপরে	৬০.০৬	৩৯.৯৪[২৮]

২৮. উদ্ধৃত, অজয় রায়, "বাংলাদেশের ভূমি-ব্যবস্থা, সমস্যা ও সমাধান", পৃ—৪৭।

দেখা যাচ্ছে ৫'০০ একরের উর্ধ্ব জমির মালিকরা প্রায় ৩৯'৯৪ ক্ষেত্রে অর্থাৎ শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ ক্ষেত্রে ক্ষেতমজুর দিয়ে চাষাবাদ করে। সংখ্যাটা নেহায়েৎ ফেলনা নয়।

আমাদের এখানে কৃষির পলিটিক্যাল ইকনমি বিষয়ক যে সব লেখা হয়, তা' হয় মূলতঃ অভিজ্ঞতাবাদ ও পরিসংখ্যানবাদ পদ্ধতি দ্বারা। তবে মার্কসবাদীরা শুধুমাত্র পরিসংখ্যান দ্বারা সন্তুষ্ট নন, যতক্ষণ পর্যন্ত না পরিসংখ্যানসমূহের মধ্যেকার কার্যকারণটি (Cause & effect) বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে। আমরা দেখাতে চেষ্টা করব কিভাবে বিগত কয়েক বছরে জমি আমাদের দেশে ধনিকদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং এর বিপরীতে সৃষ্টি হয়েছে নিঃস্বকরণের, তথা ক্ষেতমজুর হওয়ার প্রক্রিয়াটির।

পরিসংখানের খুব জটিলতায় না গিয়েও বলা যায় যে মোটামুটি ২'৫০ একরের বেশী জোতের মালিক ৯% থেকে ১০ গ্রামীণ পরিবার মূলত ক্ষেতমজুর নির্ভর এবং এদের জমির পরিমাণ ৬০%। এখন পর্যন্ত ক্ষেতমজুরের মজুরীর দ্বন্দ্ব মূলতঃ এদের সঙ্গেই।

এছাড়া মাঝারী ও ছোট জমির মালিক আর যে ৩৪% গ্রামীণ পরিবার ক্ষেতমজুর নিয়োগ করে, এদের সবার চরিত্র ঠিক পুঁজিবাদী এমনটা বলা যাবে না। অনেকক্ষেত্রেই নানারকম আত্মীয়তা, সামাজিক ও দাতা-গ্রহীতার সম্পর্কের মাঝে মজুরী-শ্রম শোষণটা ঢাকা পড়ে আছে।

এছাড়া অনেক ক্ষুদে কৃষক ও প্রান্তিক চাষীরা যে বছরের কোনো না কোনো সময় মজুরীর বিনিময়ে অন্যের জমিতে কাজ করছেন, এ আজকের গ্রাম-বাংলার এক দৈনন্দিন বাস্তবতা, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই কর্মনিয়োগর চুক্তির ধরণটা প্রায়-পুঁজিবাদী। সবাই মিলে গোশ্‌ত-ভাতের বিনিময়ে উৎসবের মত অন্যের জমিতে "পাইট কাটা" তো ক্রমশঃ উঠেই যাচ্ছে। বাসস্থান ও অনুর্ধ অর্ধ-একর চাষযোগ্য জমির মালিক, যারা সকল গ্রামীণ গৃহস্থালীর ১৫%, এদের পক্ষে লাভজনকভাবে আর তাদের এত সামান্য চাষযোগ্য জমি চাষ করা বা স্ব-চাষে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এরা

নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ার শিকার হয়ে দ্রুত ভূমিহীন হওয়ার পথে এবং অনেকেই ক্ষেতমজুরী করছেন। জমির ক্ষেত্রে এই সাবিক নিঃস্ব-করণের হার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরাই স্বীকার করতে বাধ্য হ'চ্ছেন যে দেশের মোট জমির তিন একর করে জোতাকার ধরে (যার নীচে জোত থাকলে বর্তমান প্রেক্ষিতে চাষাবাদ অর্থনৈতিকভাবে তেমন লাভজনক হবে না, এবং ১০ বিঘার মত জমির মালিক স্বচ্ছল একটা কৃষক শ্রেণী পুঁজিবাদী বাজারের আওতা সম্প্রসারিত করবে ও বর্তমান সরকারের শ্রেণীভিত্তি গড়ে তোলার জন্য যাদেরকে সরকারের প্রয়োজন) জমি পুনঃ-বিতরণ করলে প্রায় ৫০ লক্ষ ভূমিহীন ও প্রায়-ভূমিহীনকে হিসেবের আওতার বাইরেই রাখতে হবে। আর জমি হারানো ও নিঃস্বকরণের এ প্রক্রিয়া তত দ্রুতই চলতে থাকবে যত দ্রুত কৃষিতে মজুরীশ্রম বৃদ্ধি পাবে এবং আত্মপোষণশীল গৃহস্থ উৎপাদন ধ্বংস হবে, অর্থাৎ, কৃষিতে পুঁজিবাদ আসবে। এবং বিশ্বব্যাঙ্ক ও সাম্রাজ্যবাদ ঠিক সেটাই চায়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের, এমনকি তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলোর তুলনায়ও বাংলাদেশের কৃষি-জোতের আকার বা আয়তন খুবই কম। প্রায় ১০ কোটি লোকের জন্য দেশে মোট আবাদী জমির পরিমাণ হোল মাত্র ২,২৩৬ কোটি একর,[২১] যার ৯৫%ই এখন ব্যবহৃত হ'চ্ছে। ওদিকে জেনারেল এরশাদ আমেরিকায় গিয়ে যতই জনসংখ্যা বিষয়ক পুরস্কার নিক্ না কেন, জনসংখ্যা প্রতি বছরই ২৫ লক্ষ করে বেড়ে চলেছে। ১৯৭৮-৭৯ সালে মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ ছিল মাত্র ০'৩ একর ও কৃষক পরিবারের প্রতি জনের মাথাপিছু জমির পরিমাণ মাত্র ০'৪ একর। বর্তমানে তা আরো কমেছে। কেউ এই প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, কৃষিতে পুঁজিবাদের ধ্রুপদী ধারণা অনুযায়ী, এত ছোট জোতে কি পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশ সম্ভব? এক্ষেত্রে আমাদেরকে, বহু বছর আগেই চায়ানভের সঙ্গে বিতর্কে এই প্রশ্নে লেনিন যা বলে গিয়েছিলেন তা' মনে রাখতে হবে। লেনিনের মতে, খামারের

২১. অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ—৫০।

আয়তনটা বড় কথা নয়, পুঁজিবাদ হ'চ্ছে কিনা সেটা বোঝার ক্ষেত্রে বড় ব্যাপার হ'চ্ছে সম্পর্কগুলি কি ? সেগুলি কি পুঁজিবাদী ?

জমির কেন্দ্রীভবনের ক্ষেত্রে আমরা দেখাতে চেয়েছি যে প্রক্রিয়াটি পুঁজিবাদী। পরবর্তীতে সার, সেচ, কীটনাশক ইত্যাদি কৃষি-উপকরণ ও কৃষিপণ্যের বাজারজাত প্রসঙ্গে বিষয়টি আরো প্রমাণের চেষ্টা আমরা নেব। এ পর্যায়ে এখন শুধু বলতে চাই যে, এমনকি বর্গাপ্রথা, যা ছিল সামন্তবাদের এক অনুসঙ্গ, বর্তমানে তাও কি দ্রুত এক প্রাক-ধনতান্ত্রিক বা প্রায়-ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কে পরিণত হ'চ্ছে না ? আর উপকূলীয় জেলাগুলোতে চিংড়ী চাষ তো প্রায় পুরোপুরিই পুঁজিবাদী ধারায়। তামাক চাষের ক্ষেত্রে রয়েছে বিটিসি-র মত বহুজাতিক কোম্পানীর দোর্দণ্ড উপস্থিতি, কিম্বা চা-য়ের ক্ষেত্রে বৃটিশ বহুজাতিক-কোম্পানীগুলি।

সেচ প্রসঙ্গে

শুধুমাত্র কৃষির আধুনিকায়ণ নয়, যান্ত্রিক উপায়ে জলসেচের একটা বাস্তব কারণও আজ বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়েছে, তা' হ'চ্ছে মাঠের পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া। মাটির উর্বরা শক্তি ক্রমশঃ কমে আসছে। সে কারণেই এসেছে, 'অধিক ফসল ফলাও'-এর ডাক নিয়ে গভীর ও অগভীর নলকূপের প্রচলন। কিন্তু বাস্তবতার দ্বান্দ্বিকতা এমনই যে দেখা যাচ্ছে নলকূপ ব্যবহার করার ফলেই অনেক জায়গায় পানির স্তর আরো নীচে নেমে গেছে। যত্রতত্র অপরিকল্পিতভাবে নলকূপ বসানোর ফলে তেরটি জেলায় পানির স্তর স্বাভাবিকের চেয়ে নীচে চলে যাচ্ছে। জেলাগুলো হো'ল ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, নাটোর, নওয়াবগঞ্জ, নওগাঁ, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া ও জয়পুরহাট। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সরকার বাধ্য হ'চ্ছে ৩৪টি উপজেলায় অগভীর নলকূপ ও ১0টি উপজেলায় গভীর নলকূপ বসানো নিষিদ্ধ করতে।[৩০]

---

৩০. "সংবাদ", ২৫শে এপ্রিল, ১৯৮৭।

উফশী ও অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানের হাত ধরে একদিন এদেশে যান্ত্রিক নলকূপ এসেছিল। তবে বাংলাদেশে প্রকৃতই অধিক খাদ্য ফলানো না সাম্রাজ্যবাদের এসব জিনিষ বিক্রীয় বাজার পাওয়ার চেষ্টা হিসেবে নলকূপ ব্যবস্থার প্রচলন, সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, গত কয়েক বছরে সেচ-যন্ত্র নিয়ে যা ঘটছে তা' সাম্রাজ্য-বাদের স্বার্থই রক্ষা করছে।

সরকারের উপর পুঁজিবাদী দাতা দেশগুলোর চাপ ছিল বিএডিসি -র থানাভিত্তিক বিতরণ পদ্ধতির পরিবর্তে ব্যক্তিখাতে ডিলারশিপ প্রদান ও দামের উপর থেকে নিয়ন্ত্রন তুলে নেয়া। ৭৫-পরবর্তী সামরিক (বা বেসামরিক!) মুৎসুদ্দী সরকারগুলো সহজেই সে চাপের কাছে নতি স্বীকার করে। ব্যক্তিখাতে সেচযন্ত্র দিয়ে দেয়া হয় ও এর দামের উপর থেকেও নিয়ন্ত্রন তুলে নেয়া হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এর উদ্দেশ্য হ'চ্ছে গ্রামের ধনিক শ্রেণীটাকে লাভবান করা। ভণ্ডামিটা শুরু হয়েছে শুরু থেকেই। সরকার 'ভর্তুকি-দেবে-না' এই যুক্তিতে সেচযন্ত্র ব্যক্তিমালিকানায় তুলে দেয়ার মুহূর্তেও কিন্তু ওই ব্যক্তিমালিককে দেয়া হ'চ্ছে বড় অঙ্কের ভর্তুকি। আর সরকারী ব্যাঙ্ক-ঋণের মাধ্যমে তাকে পাইয়ে দেয়া হচ্ছে আরো অপ্রত্যক্ষ ভর্তুকি। এই সেচযন্ত্রকে দিয়ে তৈরী হ'চ্ছে গ্রামে এক নতুন মুৎসুদ্দী ধনিক শ্রেণী। জল ভাড়া দিয়ে জলপ্রভুও (water lord) হ'চ্ছে অনেকে। এসব জলপ্রভুরা জলভাড়া দিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে এমনকি ফসলের তিন ভাগের এক ভাগও আদায় করে! আবার অনেকসময় এরা স্থানীয় বাসিন্দাও নয়। বস্তুতঃ ধনীরাই লাভবান হ'চ্ছে গরীব ও প্রান্তিক কৃষকের স্বার্থের বিনিময়ে। দাতা দেশগুলোর গ্রামে ধনিক মুৎসুদ্দী একটা শ্রেণী সৃষ্টির আকাঙ্খা পূরণ হ'চ্ছে।

সেচযন্ত্রগুলি ব্যক্তি-মালিকানায় দেয়ার ক্ষেত্রে সরকারের যুক্তি ছিল যে এর ফলে সেচ ক্ষমতার ব্যবহার অধিকতর দক্ষ হবে। কিন্তু সেটা এক ডাহা মিথ্যা। ভাড়া বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে কিউসেক প্রতি যেখানে জলসেচ করা হয়েছে ২০'৭ একর জমিতে সেক্ষেত্রে ব্যক্তি-

মালিকানায় তা' ঘটেছে ১৮'৭ একর জমিতে। নলকূপের ভাড়াও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮০/৮১ সালে যেখানে গভীর নলকূপের (২ কিউসেক) ভাড়া ছিল ১২০০ টাকা, সেখানে ১৯৮৩-৮৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫,০০০ টাকা।

আগে সেচ-যন্ত্র যেভাবে সমবায়ের মাধ্যমে বা যৌথভাবে ভাড়া-বন্দোবস্তের শর্তে নিতে হো'ত, তার মাঝে হাজারো সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যৌথতার একধরনের বোধ কাজ করত। বর্তমানে সে সম্ভাবনা তো উঠেই গেছে।

আর সেচের ব্যাপক ব্যবহারে জমিতে আবাদের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে হয়তো, কিন্তু সে সুবাদে ক্ষেতমজুরের শ্রম-সংস্থান বাড়ছে বলে যে আপাত-ধারণা করা হয়, তার উপরই বা কতখানি ভরসা করা যায়, যখন আমরা জানি যে সেচ-ব্যবস্থার ফলে ১৯৮৭-এর শেষ নাগাদ পর্যন্ত গ্রামের বাড়তি শ্রমশক্তির ২০%-এর কর্মের সুযোগ ঘটবে বলে যা বলা হয়েছিল[৩১] তা' তেমন কিছুই হয়নি।

বাজারে একটা ক্যালেণ্ডার দেখা যায়। একটা শ্যালো পাওয়ার পাম্প থেকে জলসেচ চলছে। পাশে জিন্সের প্যান্ট, গলায় মাদুলী, মাথায় ক্যাপ, চোখে সানগ্লাস, পেটটা ঈষৎ মোটা—জিয়াউর রহমান বসে আছে। কৃষির এই ধারার উন্নয়ন এদেশের মুৎসুদ্দী বুর্জোয়ার স্বপ্ন, আর মুৎসুদ্দী বুর্জোয়ার মানসপুত্র জেনারেল জিয়া ওখানেই থাকবে। পেছনে হয়তো বাজতে থাকবে তাঁর প্রিয় গান, "একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়!" মুৎসুদ্দী বুর্জোয়ার হাত ধরে বাংলার নিভৃত গ্রামে আজ ঢুকতে চায়—সাম্রাজ্যবাদ। নলকূপ তার অন্যতম একটা মাধ্যম মাত্র।

সার প্রসঙ্গে

মাধ্যম আরো আছে। যেমন—সার। স্বাধীনতা-উত্তরকালে আওয়ামী লীগ সরকার সারের উপর ভর্তুকী দিতেন। ফলে সারের

৩১. "Process in Landless Mobilisation in Bangladesh : Theory & Practice", FRM Hassan, BIDS, Dec— 1985, পৃ— ২১৫।

দাম গরীব কৃষকেরও আওতার মধ্যে ছিল। কিন্তু সারের উপর থেকে ভর্তুকী প্রত্যাহারের ফলে ১৯৭২ সালের তুলনায় ১৯৮৪ সাল নাগাদ ইউরিয়ার দাম বৃদ্ধি ঘটেছে ৮ গুণ, টিএসপি-র ১৮ গুণ, পটাসের ১২ গুণ। এর ফলে বর্তমানে শুধুমাত্র ধনী কৃষকরাই সার ব্যবহারে সক্ষম হ'চ্ছে এবং তা আমাদের দেশে একটা ধনিক কৃষক-শ্রেণী সৃষ্টির সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ১৯৭৫-৭৬ সালেও সরকার সারের উপর ভর্তুকী দিতেন ৫৭%। কিন্তু বর্তমানে তা' প্রায় তুলে নেয়া হয়েছে। সারের দাম কিভাবে দফায় দফায় বাড়ানো হয়েছে আমরা নীচের সারণীতে তা' তুলে ধরছি ;

তারিখ	সারের দাম (মণ প্রতি টাকা)		
	ইউরিয়া	টিএসপি (দানাদার)	এমপি (পটাশ)
১লা জুলাই, ১৯৭২	২০	১৫	১০
১লা এপ্রিল, ১৯৭৪	৫০	৪০	৩০
১লা জুলাই, ১৯৭৬	৬০	৪৮	৪০
২রা নভেম্বর, ১৯৮০	১১০	৯০	৭০
৭ই ডিসেম্বর, ১৯৮১	১৩২	১১৫	৯০
৭ই জুলাই, ১৯৮৪	১৬০	১৫৪	১২১[৩২]

এইভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে সারের দাম বৃদ্ধির ফলে কিভাবে সার ব্যবহার ক্রমশঃ ধনী কৃষকদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হ'চ্ছে তা' বোঝা যাবে এই তথ্য থেকে যে, এক একর পর্যন্ত জমির মালিক কৃষক যারা আমাদের দেশের মোট কৃষকের ৩১·৫%, তারা সার ব্যবহার করেন মাত্র ১৫·৬% ; এক থেকে আড়াই একর পর্যন্ত জমির মালিক কৃষক যারা সংখ্যায় ৩২·৮%, তারা সার ব্যবহার করেন ২৩·২% ; আর ৫ একরের বেশী জমির মালিক কৃষকের সংখ্যা মাত্র ১৩·৮% কিন্তু তারা সার ব্যবহার করেন ৩০·২%। সেচকৃত জমির প্রসঙ্গেও আমরা এই ধনী-কৃষক অভিমুখিনতা দেখতে পাই। এক একর পর্যন্ত কৃষকের

৩২. "বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা", নজরুল ইসলাম, পৃ—২৮, সারণী-৫।

বিভিন্ন বছরে সারের ব্যবহার এবং সেচ সম্প্রসারণের মাত্রা

বছর	সার বিতরনের পরিমাণ (লক্ষ টন)	মোট সেচ এলাকা (হাজার একর)				বিএডিসি কর্তৃক মাঠকৃত পাওয়ার পাম্পের সংখ্যা	বিএডিসি কর্তৃক বসানো গভীর নলকূপের সংখ্যা	বিএডিসি এবং BKB কর্তৃক বসানো অগভীর নলকূপের সংখ্যা
		নলকূপ	পাওয়ার পাম্প	মাধ্যাকর্ষণ প্রবাহ	মোট			
১৯৬৯-৭০	২·৭৭	৮০	৭৪১	৮২	৯০৫	১৭৮৪৬	১০৬০	—
১৯৭২-৭৩	৩·৮৪	৯৩	১১৬৫	৬৪	১৩২২	৩২৯১৭	২২০৪	২৫০৯
১৯৭৫-৭৬	৪·৫৮	২৬৩	১৩৬৩	৮৪	১৭১০	৩৬৩৮২	৮৮১৬	৭৪৯৩
১৯৭৭-৭৮	৭·১৯	৩১৪	১৩৭০	১৩৫	১৮১৯	৩৬৭০০	১১০২৩	১৬৭২৯
১৯৭৯-৮০	৮·৩৮	৪৪৬	১৫৩৬	২৪১	২২২৩	৩৭৩৮৯	১১৭৫০	২৭৫২৮
১৯৮২-৮৩	৯·৬৮	১০১৮	১৮৪৫	৩৭৭	৩২৪০	৩৮৯৫৪	১৭৬৬৫	৯২৬৭২
১৯৮৩-৮৪	১১·১৯	১৬৪৮	১৬৫৭	৬০৯	৩৯০৩	৪৩৬১৫	২০০৭১	১১০২৮ ([৩৪])

৩৪° উদ্ধৃত, ঐ, পৃঃ–২২ সারণী—৪ ।

সেচকৃত জমির অংশ মাত্র ১৬.৭%; এক থেকে আড়াই একর পর্যন্ত তা' ২৫.১% এবং ৫ একরের বেশী জমির মালিকদের সেচকৃত জমির পরিমাণ ৩০.২%[৩৩]। কি উন্নত সেচ-ব্যবস্থা, কি সারের ব্যবহার, সবক্ষেত্রেই এই ধনী-কৃষক অভিমুখিনতা বিদ্যমান, এবং গত কয়েক বছরে কৃষিতে আধুনিকায়ন প্রচেষ্টার যে সম্প্রসারণ ঘটেছে, তার মূল লাভটা এরাই পেয়েছে, গরীব ও প্রান্তিক চাষী পায়নি। কৃষির এই আধুনিকায়নের সম্প্রসারণ যে বেশ বড় আকারেই ঘটেছে এবং ঘটছে, পূর্বের পাতার সারণীটি থেকে তার প্রমান মিলবে।

বোঝাই যায় কৃষিক্ষেত্রে সার ও নলকূপের ব্যবহার তথা আধুনিকায়নের সম্প্রসারণ বেশ বড় ভাবেই ঘটেছে যার মূল লাভটা আমরা আগেই বলেছি পেয়েছে গ্রামের ধনিকশ্রেণী। সারের দাম এই হারে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে গরীব ও প্রান্তিক কৃষকেরা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তার আর একটা সূচক হতে পারে সার ও ধানের দামের আনুপাতিক হার। ১৯৭২ সালে যেখানে এক মণ সারের দাম ছিল ১ মণ ধানের দামের ৭৪%, সেখানে ১৯৮৩-৮৪ সালে ১ মণ সারের দাম ১ মণ ধানের দামের দ্বিগুনেরও বেশী। নীচের সারণীটি থেকে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে;

সার-ধান দামের অনুপাত

সাল	সব ধরনের সার টন প্রতি টাকা	সার-ধান দাম অনুপাত
১৯৭১-৭২	৫৭১	০.৭৪
১৯৭৩-৭৪	১৫৫৪	০.৭৬
১৯৭৬-৭৭	৩২৪২	১.৬৫
১৯৭৯-৮০	৪৭৭০	১.৬৮
১৯৮১-৮২	৬৬৪৫	১.৯৬
১৯৮৩-৮৪	৮৩০৭	২.০৩[৩৪]

৩৩. ঐ, পৃ—৩১।

৩৪. উদ্ধৃত, ঐ, পৃ—২৮, সারণী-৫।

বিএডিসি-র পুরনো থানাভিত্তিক বিতরণ পদ্ধতি পরিবর্তন করে সার বিক্রীর ব্যক্তিমালিকানাধীন যে পদ্ধতির ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে আমাদের কৃষি ক্রমান্বয়ে পুরোপুরিই দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ীর দয়া ও খামখেয়ালীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। সার বিক্রী ব্যক্তিমালিকানায় দেয়ার ফলে সম্পদ কৃষকের হাত থেকে ফড়িয়াদের হাতে চলে যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে এক নব্য-ধনিক টাউট শ্রেণী তৈরী হচ্ছে। সরকার ও সাম্রাজ্যবাদ সেটাই চায়। শহরের লুটেরা ধনীদের সহযোগী মিত্র হিসাবে গ্রামাঞ্চলে এই শ্রেণীটাকে গড়ে তোলা হচ্ছে। এরা স্থায়ীভাবে সরকারী দল করে। বিএনপির সময় বিএনপি, জনদলের সময় জনদল, জাতীয় পার্টির সময় জাতীয় পার্টি !

সার বিতরণ ব্যক্তিমালিকানায় দেয়ার ফলে বিগত কয়েক বছর সারের দাম লাফিয়ে বাড়তে বাড়তে প্রায় আন্তর্জাতিক দামের কাছাকাছি পৌঁছেছে। এটাই ছিল এবং আছে সাম্রজ্যবাদের প্রচেষ্টা। এ হারে দাম বৃদ্ধির ফলে হয়তো সার বিক্রীর পরিমাণ বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু বৃদ্ধির হারের গতি শ্লথ হয়ে আছে। ১৯৭৫-৭৮সালে যেখানে সার বিক্রীর গড় বার্ষিক হার ছিল ৩৮.৭%, ১৯৮১-৮৪ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৯.২%-এ। সার বিতরণ ব্যক্তিমালিকানায় দেয়ার ফলে সামগ্রিকভাবেই কৃষি-উৎপাদন ও কৃষি অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ক্ষেতমজুরের স্বার্থও।

কীটনাশক ঔষধের ক্ষেত্রেও এই ধনী-কৃষক ও সাম্রাজ্যবাদ অভি-মুখিনতা বিদ্যমান। এখানে শোষণের মাত্রাটা আরো তীব্র কারণ কীটনাশক ঔষধের ব্যবসার পেছনে পশ্চিমা বহুজাতিক কোম্পানী-গুলির প্রত্যক্ষ ও সরাসরি স্বার্থ জড়িত রয়েছে।

কৃষি-ঋণ ও কৃষি-পণ্যের মূল্যের ক্ষেত্রে

১৯৭২ সালে গ্রামাঞ্চলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা যেখানে ছিল ৪৪০টি, ১৯৭৮ সালের জুনে তা হয়েছে ১৫৯৪টি। বর্তমানে এ

সংখ্যা আরো অনেক বেড়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ক্রমশ গ্রামের মানুষের কাছে কিছুটা হলেও পৌঁছচ্ছে। ১৯৭৯-৮০-তে প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি-ঋণ ছিল ২৬৮.৯ কোটি টাকা, ১৯৮৪-৮৫তে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৩১ কোটি টাকা। কিন্তু এ ঋণ মূলত পাচ্ছে কারা ? এক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, এক একর জোত পর্যন্ত কৃষক, যাদের সংখ্যা ৩১.৫%, তারা একর প্রতি ঋণ পায় ৩১ টাকা যা প্রদত্ত মোট ঋণের ৩৯.২%[৩৬] মাত্র। বলার অপেক্ষা রাখে না যে কৃষি-ঋণ কৃষকের নামে দেয়া হলেও লাভবান হচ্ছে একশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী ও গ্রামের ধনিকরা। আর গরীবরা যে সামান্য ঋণ পাচ্ছে তা তাদের তেমন কোন কাজেই আসছে না। বরং অনেকক্ষেত্রে এ ঋণ তাদের উপর সিন্দাবদের সেই বুড়োর মতই ঘাড়ে চেপে বসছে। দুর্নীতি, বন্যা-খরা বা সময়মত শোধ দিতে না পারলে তাদের ক্রোক-নীলামের হাতে পড়তে হচ্ছে। সাম্প্রতিকালের উত্তরবঙ্গে ঘটে যাওয়া "মাটির ডাক" ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সরকারের চণ্ডনীতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ওদিকে ধনীরা কিন্তু ঠিকই "ম্যানেজ" করে নেয়। এর পাশাপাশি যদি আমরা কৃষি-পণ্যের দাম ধরি, তাহলে দেখব গরীব ও প্রান্তিক চাষীরা কত বেকায়দায় রয়েছে। গত দুবছরে পাটের কোন দাম তারা পায়নি। অন্যান্য ফসলের অবস্থাও তথৈবচ। সরকার বলছিল ধানের দাম ও কৃষি-ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে এই ক্ষতি পুষিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু গ্রামের খুব সামান্য সংখ্যক মানুষের হাতেই বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ধান থাকে, বেশীর ভাগ মানুষকেই বছরের বড় অংশ বাজার থেকে কিনে খেতে হয়। তাই ধানের মূল্য বৃদ্ধি ক্ষেতমজুর তো বটেই গরীব ও সাধারণ মধ্য-কৃষককেও সংকটে ফেলবে। লাভবান হবে ফড়িয়া, দালালরা ও কিছু ধনী কৃষক। এছাড়া কৃষিপণ্যের সঞ্চালতাও ক্রমশঃ পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির আওতায় এসে পড়ছে। ধান ৩০% বাজারজাত হয়। পাট, তামাক, আখ ২৮%। গম প্রায় পুরোটাই। আর পাট ব্যবসার অভ্যন্তরীন ব্যবসার অনেকখানি ও বহির্বাণিজ্যের প্রায়

---

৩৬. উদ্ধৃত, ঐ, পৃ—৩৩।

গোটাটাই ব্যক্তি-মালিকানায় দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাজার অর্থনীতির প্রভাব ক্রমশই বাড়ছে এবং সাম্রাজ্যবাদও সেটাই চায়।

অভিজ্ঞতা দেখায় যে ধনী কৃষকদের কিছু উদ্বৃত্ত পুঁজি থাকলেও তারা তা দিয়ে উন্নত যান্ত্রিক কৃষি প্রবর্তনে তেমন আগ্রহী নয়। কারণ মহাজনী কারবার ও বর্গাশোষন এখনও অধিক লাভজনক। এছাড়া হাতছানি হিসেবে রয়েছে ঠিকাদারি, নানা ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য, শহরে জমি বা স্থাবর সম্পত্তি কেনা, সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় পুঁজি বিনিয়োগ করা, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত অর্থ কৃষিতে আর পুনর্বিনিয়োগ হচ্ছে না। এছাড়া ইউনিয়ন কাউন্সিল, উপজেলা কাউন্সিল বা ক্ষমতাসীন সরকারী দলে যোগ দিয়ে প্রভাব খাটিয়ে কৃষি-ঋণ পেয়ে বা কৃষি-উপকরণের ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে গ্রামের ধনিকদের যে অংশটি বিত্ত সঞ্চয় করছে, সেই অর্থও ভোগ্যপণ্য ক্রয় কিম্বা নানা অকৃষিজ খাতেই বিনিয়োজিত হচ্ছে।

একথা সত্য যে বিগত কয়েক বছরে দেশে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে। ১৯৬৭-৭০ সালে যেখানে চাল উৎপাদন হয়েছে ১১৭.৮ লক্ষ টন, ১৯৭৫-৭৬ সালে সেখানে ১২৫.৬ লক্ষ টন এবং ১৯৮৩-৮৪ সালে ১৪২.৮ লক্ষ টন। এবং বড় রকম কোনো বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা না দিলে প্রতিবছরই এটা কিছুটা বাড়তে পারে। তবে জনসংখ্যার বৃদ্ধির আনুপাতিক হারের তুলনায় খাদ্য-শস্য উৎপাদনের বৃদ্ধি পিছিয়েই থাকছে এবং দেশে খাদ্য ঘাটতি একটা প্রায় চিরন্তন অবস্থায় পরিণত হয়েছে। এমনকি কৃষিতে বাজেটের বরাদ্দও কমছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে কৃষিতে বরাদ্দ ছিল বাজেটের ৩৩.৩%, দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় তা' ধার্য করা হয় ২৮.৯% এবং ১৯৮৫-৮৬ সালে তা' কমে দাঁড়ায় ১৬%-এ।[৩৭]

কৃষির সাথে এখনও জড়িত এমন কিছু ধনী কৃষকদের কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধিতে কিছুটা আগ্রহ থাকলেও কৃষি-ঋণের সিংহ ভাগ, উপজেলার বরাদ্দ অর্থ, কৃষি-উপকরণের ব্যক্তিগত ব্যবসা, ঠিকাদারী, ঘুষ-দুর্নীতি, মধ্যপ্রাচ্য-ফেরৎ অর্থ, সরকারী দল ও সরকারী কর্ম-

৩৭. রাজনৈতিক রিপোর্ট, চতুর্থ কংগ্রেস, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, পৃ—২১।

চাষীদের বিশেষ অবৈধ আনুকূল্য, চিংড়ী চাষ ইত্যাদি নানা পন্থায় গ্রামাঞ্চলে আজ যে একটি নব্য কায়েমী স্বার্থ গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে, কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাদের কোনোই আগ্রহ নেই। গ্রামাঞ্চলে মুৎসুদ্দী পুঁজির বিকাশের লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদ গ্রামাঞ্চলে এই শ্রেণী-টিকে সৃষ্টি ও পৃষ্ঠপোষকতা করতে চায়। আবার পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদ শুধু কৃষির সঙ্গে জড়িত এমন একটা ধনী কৃষকশ্রেণীও গ্রামে গড়ে তুলতে চায় যারা বিপুল কৃষি ঋণ, আধুনিক কৃষি-উপকরণ, বিদ্যুৎ, সার-বীজ এসবের সুযোগ নেবে, ক্ষেতমজুর খাটিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করবে এবং কৃষি উৎপাদনকে ক্রমশঃ পুঁজিবাদী বাজার-অর্থনীতির ভিত্তিতে দাঁড় করাবে। এই ব্যবস্থার অধীনে উৎপাদন ও কৃষি-পণ্য বাজারজাত করলে এই গোষ্ঠীর সাথে শহরের আমলা-মুৎসুদ্দী পুঁজির নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং ক্রমান্বয়ে তারাই হয়ে উঠবে কৃষি-অর্থনীতির মূল নিয়ন্ত্রক।[৩৮] বিগত কয়েক বছর ধরেই এই প্রক্রিয়া চলছে এবং জিয়া ও এরশাদ পর পর এই দু'টি সামরিক সরকারের আমলে এই প্রক্রিয়া আরো ত্বরান্বিত ও বেগবান হয়েছে। কৃষি-অর্থনীতিতে এখন যা ঘটছে, তা' পুরোটাই ঘটছে সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী এবং এক্ষেত্রে এদেশের আমলা-মুৎসুদ্দী পুঁজির সরকারগুলো যো-হুজুরের ভূমিকা পালন করে চলেছে মাত্র। কৃষিতে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ এখনও হয়তো পূর্ণতা পায়নি, রয়েছে নানা সামন্তবাদী অবশেষ, তবুও কৃষি-উপকরণের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ধারাই ক্রমশঃ মুখ্য হয়ে উঠছে। লেনিনের ভাষায় বলতে গেলে, "এখানে পরিসংখ্যান একক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, বরং সম্পর্কটি, যেটা সংখ্যাগুলির মাঝে ঢাকা পড়ে আছে। সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশই হোক, আর অস্পষ্টভাবেই হোক, সে সম্পর্ক হোল, পুঁজিবাদী।"[৩৯]

তবে প্রতিবন্ধকতাও কম নয়। গ্রামীণ অর্থ কৃষিতে পুনর্বিনিয়োগ হ'চ্ছে না। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে কর্মরত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহে যে

---

৩৮. ঐ, পৃ—৩১।

৩৯. "লেনিন রচনাবলী", খণ্ড-১০, পৃ—২১৯।

পরিমাণ অর্থ জমা হয় তার খুব সামান্য অংশই কৃষিতে বিনিয়োগ হয়। বেশীর ভাগই স্থানান্তরিত হয় শহরে। এটা কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ ত্বরান্বিত হওয়ার ক্ষেত্রে এক বড় বাঁধা। তাছাড়া সামন্তবাদের দুই অবশেষ বর্গাচাষ ও মহাজনী প্রথা এখনও যথেষ্ট শক্তি নিয়েই টিকে আছে। বস্তুতঃ বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামো এখনও বহুগাঠনিক (multi-stuctural)। সামন্তবাদের অবশেষসমূহ রয়েছে, রয়েছে প্রাক-পুঁজিবাদী নানা অন্তবর্তীকালীন বৈশিষ্ট্য, যদিও পুঁজিবাদী ধারাটাই ক্রমশঃ জঙ্গম হয়ে উঠছে। তবে কৃষিতে পুরোদস্তুর পুঁজিবাদী ধারার বিকাশ বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ কৃষিতে বর্ধিত হারে পুঁজি বিনিয়োগ ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পুনরুৎপাদন, মূলতঃ ক্ষেতমজুর দ্বারা ও বাজারের জন্য উৎপাদন, তাও বর্তমান প্রেক্ষাপটে কতখানি সম্ভব, সে প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই উঠতে পারে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে কৃষির বিকাশ একটা কানাগলিতে আটকে থাকছে এবং বাংলাদেশে যে দক্ষিণ কোরিয়া বা তাইওয়ানের ধারায় কৃষিতে পুঁজিবাদ ত্বরান্বিত করা তেমন সম্ভব নয়, এ ব্যাপারে অনেক অর্থনীতিবিদই একমত।[৪০] এসব দেশে অন্যান্য আরো অনেক কারণের উপস্থিতি ছিল, যা বাংলাদেশে নেই।

কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ ও কৃষি-উন্নয়নের "সাফল্য" (!) সম্পর্কে পুঁজিবাদের প্রবক্তা অর্থনীতিবিদেরা প্রায়শঃ ষাট দশকে আইউব খানের আমলের "সবুজ বিপ্লব" (!)-এর উদাহরণ টানেন। সে সময়ে কৃষিতে উৎপাদন কিছু বেড়েছিল ঠিকই, কিন্তু আমরা গ্রামের মেহনতী মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখব যে ১৯৬৮ সালের মাস্টার সার্ভের হিসাব অনুযায়ী ১৯৬০ সালের তুলনায় ১৯৬৪ সালে এই আট বছরে গ্রামাঞ্চলে নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া বরং তীব্রতর হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ছাড়াও এ সময়কালে গ্রামীণ মহাজনদের কাছে কৃষকদের ঋণ বেড়েছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে যা

৪০. দেখুন, অজয় রায়, "বাংলাদেশের ভূমি-ব্যবস্থা, সমস্যা ও সমাধান", এম এম আকাশ, "বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতি (সাম্প্রতিক প্রবণতা-সমূহ)" গ্রন্থ।

ছিল ৯০ কোটি টাকা, ১৯৬৯-৭০ সালে তা' বেড়ে হয়েছিল ১৫০ কোটি টাকা। এই সময়কালটাতে (১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৮-৬৯) দারিদ্র্যের পরিমাণ ও দারিদ্র্যের সংখ্যাও বেড়েছে : নীচের সারণীটি তার প্রমাণ ;

বছর	সম্পূর্ণ দারিদ্র		চূড়ান্ত দারিদ্র্য	
	পরিবার	জনসংখ্যা	পরিবার	জনসংখ্যা
১৯৬৩-৬৪	৫১.৭	৪০.২	৯.৮	৫.২
১৯৬৮-৬৯	৮৪.১	৭৬.০	৩৪.৬	২৫.১[৪১]

বস্তুতঃ ভূমি-ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে, অর্থাৎ উৎপাদন-সম্পর্কে পরিবর্তন না ঘটিয়ে উৎপাদন-বৃদ্ধি শুধুমাত্র তেলা মাথায়ই তেল দেবে, গরীবদের উপকারে আসবে না। মেহনতী কৃষকদের স্বার্থে কোনোরকম ভূমিসংস্কার ছাড়া এদেশে পুঁজিবাদী ধারা প্রসারের যে চেষ্টা চলছে, তাতে নিঃস্বকরণের প্রক্রিয়াটিই তীব্র হ'চ্ছে। বাড়ছে ভূমিহীন-ক্ষেতমজুরদের সংখ্যা ও অমানবিক দারিদ্র্য। আর এ ব্যাপারে দায়ী সরকারী নীতি ও আইনসমূহ।

সরকারী আইনসমূহ : কার স্বার্থে ?

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে আজ যে সর্বাত্মক নৈরাশ্য ও করুণ অবস্থা তার কারণ সরকারের নীতির অনুপস্থিতি নয়, বরং এ পরিস্থিতি সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিসমূহেরই ফল। আমরা জমির শিলিং, সার, সেচ ও কীটনাশক ঔষধের প্রশ্নে এটা আগেই দেখতে চেষ্টা করেছি যে আমাদের দেশের সরকারী কৃষি-নীতি মূলতঃ পরিচালিত হ'চ্ছে বিশ্বব্যাঙ্ক, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা ও বহুজাতিক কোম্পানীসমূহের পরামর্শে ও চাপে। মূল লক্ষ্য হচ্ছে জমি থেকে ছোট ও মাঝারী কৃষককে উৎখাত করে কৃষিতে, তথা গ্রামাঞ্চলে, একদল ধনী কৃষক ও একটা মুৎসুদ্দী শ্রেণী সৃষ্টি করা।

৪১. উৎস : Dr. A. R. Khan : "Poverty and Inequality, in Rural Bangladesh", উদ্ধৃত, আয়েশা বানু, পৃ—৩২।

আইয়ুবের বুনিয়াদী গণতন্ত্র থেকে শুরু করে এরশাদের প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ—রাষ্ট্র এসেছে গ্রামের দরিদ্র জনগণের কাছে। তবে সর্বদাই শোষণের বাড়তি একটা হাত হিসেবে। একটার পর একটা সরকার কর্তৃক বিশ্বব্যাঙ্কের তত্ত্ব অনুযায়ী "চুঁইয়ে পড়া" (Tickle down) 'উন্নয়ন' (!) গ্রামের গরীবদের ভাগ্যে জোটেনি। বরং গ্রাম থেকে সম্পদ ক্রমশঃই শহরে পাচার হয়েছে। যেমন ১৯৮৩ সালে গ্রাম থেকে বাইরে প্রবাহিত পণ্যের মোট মূল্য ছিল ৯১১'০৪ কোটি টাকা এবং একই বৎসরে বাইরে থেকে গ্রামে গেছে ৮৯১'১৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ সম্পদ গ্রাম থেকে শহরে চলে যাচ্ছে। শহর ফুলে ফেঁপে উঠছে। গ্রামাঞ্চলে একটা অকৃষিজ মুৎসুদ্দী শ্রেণী সৃষ্টি ছাড়াও, সরকারের কৃষিনীতির আরেকটা লক্ষ্য হ'চ্ছে গ্রাম থেকে সম্পদ শহরে পাচারের বর্তমান ধারাটাকে অব্যাহত রাখা। ফলে গ্রাম হয়ে পড়েছে—রিক্ত, নিঃস্ব। আর এই সার্বিক নিঃস্ব-করণ প্রক্রিয়ার সবচে করুণ শিকার—ক্ষেতমজুর শ্রেণী।

আর বর্তমান রাষ্ট্র-ব্যবস্থাটা যে কতখানি গ্রামীণ ক্ষেতমজুরদের স্বার্থের পরিপন্থী তা বোঝা যাবে এই তথ্য থেকে যে আই এল ও-র সর্বশেষ কনভেনশন নং ১৪১ সহ ক্ষেতমজুরের স্বার্থরক্ষা সংক্রান্ত কনভেনশন নং ১০, ১১, ১২, ২৫, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৯৯ ও ১০১, এর কোনোটাই বাংলাদেশ সরকার আজো স্বাক্ষর করেনি। সরকার ক্ষেতমজুরদের যৌথ দর-কষাকষির অধিকারসহ পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার মানছে না। এসব অধিকারের ভিত্তিতে একটা "পূর্ণাঙ্গ কৃষি শ্রম আইন" প্রণয়নের যে দাবী বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতি তুলেছে, তাও মানছে না।

আর সরকারের ক্ষেতমজুর-বিরোধী চরিত্রটির সবচে' ন্যাক্কারজনক রূপটি আমরা দেখি ১৯৮৩ সালের ১লা মার্চ সামরিক শাসন কঠোর হওয়ার পর সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক এই গোপন নির্দেশ যে ১০% পর্যন্ত গম এদিক-সেদিক হলে কোন মামলা না নেয়া! অর্থাৎ এভাবে গম-চোর চেয়ারম্যান-মেম্বারদের দ্বারা ক্ষেতমজুরদের হকের মাল মেরে খাওয়া জায়েজ করা। গ্রামাঞ্চলে নিজের ভিত্তি

তৈরীর জন্য বর্তমান সামরিক আমলা-মুৎসুদ্দী সরকারকে এটা করতে হয়েছে। এছাড়া আগের বছর কোর্ট থেকে গমচুরি মামলা তুলে নেয়ার সরকারী নির্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে পড়লে, সোচ্চার প্রতিবাদের মুখে সরকার তা' প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। অথচ এই সরকার দুর্নীতি দমনের ঘোষণা দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিল !!

তবে সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী বর্তমানের আমলা-মুৎসুদ্দী সরকারের কাছ থেকে কেউ ক্ষেতমজুরদের হিতাকাঙ্খী আইন প্রত্যাশা করে না। বস্তুতঃ আইন প্রণয়ন ও তা' বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটা পর্যায়েই ক্ষেতমজুর-শ্রেণীকে লড়ে যেতে হবে। আর অসুবিধা আরেকটি দিকেও রয়েছে। তা' হ'চ্ছে অসংগঠিত ক্ষেতমজুর শ্রেণীর সামনে আইন থাকা আর না-থাকা প্রায় একই ব্যাপার। খাস জমির আইন ক্ষেতমজুরের পক্ষে থাকলেও সংগঠিত শক্তির অভাবে ক্ষেতমজুররা সে জমির দখলী পায়নি। ওই যে মার্কস বলেছিলেন "সংগঠন ছাড়া সর্বহারার আর কোনো শক্তি নেই", তেমনি সংগঠন ছাড়া ক্ষেতমজুরেরও কোনো শক্তি নেই যার দ্বারা সে বিদ্যমান আইনসমূহকে বাস্তবায়ন কিম্বা তার পক্ষে নতুন আইন প্রণয়নে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করতে পারে। এ পর্যায়ে রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে ক্ষেতমজুর শ্রেণীর দ্বন্দ্ব যত তীব্র হবে ততই ক্ষেতমজুরের সংগ্রাম গুণগত একটা নতুন পর্যায়ে উঠে আসবে। রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে যে কোনো দ্বন্দ্ব ক্ষেতমজুর শ্রেণীকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করবে। বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির কর্মী ও নেতারা ইতিমধ্যেই প্রায় শতাধিক ফৌজদারী ও দেওয়ানী, উভয়বিধ মামলা-মোকাদ্দমার শিকার হয়েছেন এবং একথা সহজেই বলা যায় যে আগামীতে ক্ষেতমজুর শ্রেণীর আন্দোলন যত তীব্র, ব্যাপক ও জঙ্গী হবে, ক্ষেতমজুরদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা-মোকদ্দমা, খুন-জখম-নির্যাতনের সংখ্যা ততই বাড়তে থাকবে।

কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রশক্তিকে আগলে আছে সাম্রাজ্যবাদ। ক্ষেতমজুর আন্দোলন তাই অবশ্যম্ভাবীরূপেই সাম্রাজ্যবাদকে চিহ্নিত করবে। করাতের ছোট দাঁতের উপর বড় দাঁত থাকে। গ্রামীণ

ধনী-কৃষক, জোতদারের উপরে আছে শহুরে আমলা-মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া, লুটেরা ধনিক ও তাদের সরকার এবং সবার উপরে—সাম্রাজ্যবাদ। বস্তুতঃ তৃতীয় বিশ্বের গ্রামাঞ্চলের প্রগতিশীল পুনর্গঠনের প্রেক্ষিতটা আজ আন্তর্জাতিক হয়ে পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তৃতীয় বিশ্ব থেকে যে সমস্ত কৃষিপণ্য আমদানী করে—পাট, চা, তূলা, তামাক, কফি, কোকো, তার দাম কমছে, ওদিকে দফায় দফায় দাম বাড়ছে সাম্রাজ্যবাদ তৃতীয় বিশ্বে যে সব শিল্পজাত পণ্য রপ্তানী করে। প্রান্তস্থ পুঁজিবাদের দেশসমূহ থেকে সম্পদ পাচার হ'চ্ছে মেট্রোপলিটন দেশসমূহে, যেমন গ্রাম থেকে সম্পদ পাচার হ'চ্ছে শহরে। রাজনৈতিক বিচারে ক্ষেতমজুরের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান সাম্রাজ্যবাদের। ক্ষেতমজুর আন্দোলন তাই অবশ্যাম্ভাবীরূপেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও তার পদলেহী আমলা-মুৎসুদ্দী সরকারের বিরুদ্ধে জঙ্গী অবস্থান নিতে বাধ্য।

একই সঙ্গে, কৃষকের সঙ্গে মজুরীর প্রশ্নে ক্ষেতমজুরের দ্বন্দ্ব থাকলেও, ফসলের দাম ও কৃষি-উপকরণের দাম কমানোর জন্যে কৃষক-সমাজের যে দাবী তা কৃষক সমাজকেও সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি করবে, এবং, তার এই আন্দোলনের একটা জাতীয় ও দেশপ্রেমিক চরিত্রও থাকতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ক্ষেতমজুর শ্রেণী কৃষকশ্রেণীর এই ভূমিকাকে অবশ্যই বিবেচনায় রাখবে।

ক্ষেতমজুরের বাঁচার দাবী—দশদফা

কর্মসংস্থান

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার হিসাব মতে ১৯৮৫-তে গ্রামাঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৩০ লক্ষ। ২০০০ সাল নাগাদ এ সংখ্যা দাঁড়াবে ৫ কোটি ৪ লক্ষ। এ ছাড়া প্রতি বছর ১২ লক্ষ শ্রমিক শ্রমবাজারে আসছে। ১৯৮৫ সালের মাঝামাঝি নাগাদ দেশে বেকারের সংখ্যা ছিল ৭০ লক্ষ এবং ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত

নতুন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়বে আরো ৪৮ লক্ষ। কাজেই ১৯৯০ সাল নাগাদ দেশে মোট কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়াবে এসে ১ কোটি ১৮ লক্ষে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই ব্যাপক শ্রমশক্তির অধিকাংশই কৃষিখাতে ভীড় জমাবে। অথচ প্রচলিত কৃষি-ব্যবস্থায় এই অতিরিক্ত ও অদক্ষ শ্রমিকের মাত্র ২০ ভাগকে কর্মসংস্থান দেওয়াই কঠিন হয়ে পড়বে।

পরিসংখ্যান বলে ক্ষেতমজুরদের গড়ে ১২০ দিন কৃষিকাজ থাকে, ৮০ থেকে ১০০ দিন নানা অকৃষিজ কাজ করে তাদেরকে জীবিকা সংগ্রহ করতে হয়, এবং বছরে গড়ে প্রায় ১৪৫ থেকে ১৬৫ দিন স্রেফ বেকার থাকতে হয়। যদিও হাল দেয়া, রোয়া গাড়া ও ফসলকাটার সময় ক্ষেতমজুরের শ্রমটাই থাকে প্রধান, ফলে কাজের সুযোগ থাকে, তবুও এমনকি দুই ফসলা জমিতেও ৭/৮ মাসের বেশী কাজ থাকে না। কাজ থাকে না ফাল্গুন চৈত্রে, কাজ থাকে না আশ্বিন-কার্ত্তিকে, যে কারনে আজো কার্ত্তিক মাসকে গ্রামে বলা হয় 'মরা কার্ত্তিক'!

সারা বছরের হিসেবে কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমের অর্ধেক আসে স্ব-চাষীর পারিবারিক শ্রম থেকে, ১/৪-এর বেশী ক্ষেতমজুর এবং বাকীটা বর্গাচাষীর শ্রম থেকে।[৪২] যখন নিয়োজিত হয় তখন বীজ বপন থেকে ধান মলন দিয়ে গোলায় তুলে দেয়া পর্যন্ত গোটা কাজটাই ক্ষেতমজুরদের করতে হয়। আর এই কাজের দৈনিক কোনো সুনির্দিষ্ট সময়-সীমা নেই। ১২ ঘণ্টা, ১৪ ঘণ্টা উদয়াস্ত শ্রম করতে হয়। অনেক জেলায় কাজ পেতে হলে ক্ষেতমজুরকে জমির মালিকের কাছে বেগার খাটতে হয়। উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চলে ক্ষেতমজুরদের ধান কাটার কাজ পেতে অতিরিক্ত ৩/৪ মাস বেগার খাটতে হয়। ভাটি এলাকায় কাজ পেতে ভূ-স্বামীর দাদন নিতে হয় এবং দাদনের টাকা যোগাড় করতে আবার মহাজনের খপ্পরে পড়তে হয়। যখন মজুরীর হার কম থাকে তখন চুক্তিবদ্ধ করিয়ে যখন মজুরীর হার বেশী থাকে তখন ওই পুরনো হারেই ক্ষেতমজুরদের মজুরী দেয়া হয়। অভাবের

---

৪২. বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের রিপোর্ট, সম্মেলন, ১৯৮৬, পৃ—১৩।

তাড়নায় ক্ষেতমজুর তার শ্রম আগাম বিক্রী করে দিতে বাধ্য হয়। ক্ষেতমজুরের শ্রম-শোষণের এ এক বেশ পুরনো কৌশল।

সে কারণেই ক্ষেতমজুর সমিতি এই দাবী তুলেছে যে "যখনকার কাম তখনকার দাম"। দারিদ্র্যের যে প্রান্তসীমায় ক্ষেতমজুরদের অবস্থান সেখানে দর-কষাকষির তেমন কোনো সুযোগ তাদের থাকে না। অনেক সময় সামান্য উপকরণ (tools)-এর অভাবের কারণেই তারা কাজ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন কোদালের অভাবে মাটি কাটার কাজে অনেক সময় তারা অংশ নিতে পারে না।

যেসব ক্ষেত্রে ব্যাপক সংখ্যায় ক্ষেতমজুরদের কাজের সন্ধানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়, এক জেলা থেকে অন্য জেলায় কাজের সন্ধানে (migration) যেতে হয়, সেখানে তারা রেলওয়ের টিটি, পুলিশ-চৌকিদার, স্থানীয় টাউট-বদমাশদের দ্বারা নানা নির্যাতনের শিকার হয়। এসব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এসব অঞ্চলে সরকারী উদ্যোগে "কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র" স্থাপনের যে দাবী ক্ষেতমজুর সমিতি তুলেছে, তা আগামী দিনে এ ব্যাপারে একটা দিকনির্দেশক হতে পারে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি ক্ষেতমজুরেরা বলেছে ক্ষেতমজুর আন্দোলন যে করব, ক্ষেতমজুরই তো থাকতে পারি না! অর্থাৎ বছরের ৬/৭ মাস তো কোনো কাজই নেই। তখন তো সে ক্ষেতমজুরও নয়, একটা নিরালম্ব রায়ুভূত অবস্থা। সেক্ষেত্রে ক্ষেতমজুর সমিতি ক্ষেতমজুরদের জন্যে "কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা স্কীম" ও ক্ষেতমজুরদের কর্মসংস্থানের জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্দের যে দাবী তুলেছে, তা খুবই ন্যায়সঙ্গত। "কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা স্কীম" দাবীর মূল কথা হ'চ্ছে পরিবার পিছু একজনকে সারা বছর কাজ দিতে সরকার বাধ্য থাকবে। অন্যথার বেকার ভাতা। ক্ষেতমজুর পরিবারগুলির নিদারুণ আর্থিক দুঃখ-দুর্দশা ও অসহায় অবস্থার কথা মনে রাখলে এই দাবীর ন্যায্যতা ও যৌক্তিকতা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে গ্রামাঞ্চলে একটা নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রায় ২০ হাজার টাকা লাগে। তবে পাশাপাশি

এটাও সত্য যে ক্ষেতমজুরদের সারা বছর কাজ দিতে পারলে যে ১৫০ কোটি শ্রমদিবসের কর্মসুযোগ সৃষ্টি হবে তার যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে দেশের গোটা অর্থনৈতিক চেহারাটাই পাল্টে যাবে।

অবশ্য একথা সবাই বোঝেন যে, কোনো শ্রেণীবিভক্ত সমাজেই সকল মানুষের কর্মসংস্থান যোগানো সম্ভব না এবং সকলের প্রকৃত কর্মসংস্থান শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই সম্ভব। তবে যতদিন সেই সমাজ-বিপ্লব না হ'চ্ছে ততদিন কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কি করণীয় আছে ? সহজভাবে আমরা বলতে পারি যে জাতীয় ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলা ও স্থানীয় পর্যায়ে সংগ্রাম করে আংশিক দাবী আদায় করার বিষয়টি থেকেই যাচ্ছে, লেনিন যাকে বলতেন, "পাওনাটি অংশে অংশে" নিতে। বর্তমানের এক ফসলী জমিসমূহ দুই বা তিন ফসলী করে শ্রমের সরবরাহ বাড়ানো যেতে পারে এবং পরিসংখ্যান করে দেখা গেছে যে উচ্চ ফলনশীল ও নিবিড় চাষের মাধ্যমে গড়ে আরো ২০০ দিন কর্মসংস্থান হয়তো বাড়ানো সম্ভব। ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত উফশী চাষের অধীনে ছিল দেশের মোট জমির ২৪%, সেচকৃত এলাকা ছিল দেশের মোট জমির মাত্র ২১%, একটু পরিকল্পিতভাবে দেশের কৃষি-ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করলেই এই হার সহজেই বাড়ানো সম্ভব হবে যা বেশ কিছু কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি করবে।

তবে কৃষির একটা নিজস্ব সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং কৃষিতেই গ্রামাঞ্চলের সকল বাড়তি শ্রমশক্তিকে নিয়োজিত করা সম্ভব নয়, এবং তা' কাম্যও নয়। প্রয়োজন উপযুক্ত ও বিকল্প কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। সেক্ষেত্রে ক্ষেতমজুরদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নে এটা এক বড় দ্বান্দ্বিকতা যে ক্ষেতমজুরদের এক ব্যাপক অংশকেই পরিশেষে নানা অকৃষিজ খাতে (শিল্প, কুটির-শিল্প, সেবাখাত) কর্মসংস্থান খুঁজে নিতে হবে। তাদের আর ক্ষেতমজুর থাকা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

বস্তুত: এই লক্ষ লক্ষ কর্মহীন বেকার ক্ষেতমজুরের কাজ ও বেঁচে থাকার দাবী আজ গ্রামাঞ্চলে এমন এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে বর্তমান গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোয় শুধুমাত্র ভূমি-

সংস্কারের দাবীতেই আর বড় কৃষক-ক্ষেতমজুর আন্দোলন গড়ে তোলা তেমন সম্ভব নয়। জমি সবাইকে দেয়া যাবে না, ফলে অনিবার্যভাবেই চলে আসবে ক্ষেতমজুরের কর্মসংস্থানের প্রশ্নটি। ক্ষেতমজুরের মজুরী ও সারা বছরের কাজের দাবীই তাই ক্রমশঃ হয়ে উঠতে থাকবে মুখ্য ও জঙ্গম (dynamic) দাবী। এবং সে কারণেই হয়তো দেখি যে ক্ষেতমজুর সমিতির ১০-দফা দাবীনামার প্রথম দাবীটিই হচ্ছে সারা বছর কর্মসংস্থানের দাবী।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও অন্যান্য কর্মসূচী প্রসঙ্গে

৬০-এর দশকের শুরু থেকে, গ্রামাঞ্চলের তীব্র বেকারত্ব যাতে কোনো বিস্ফোরনের দিকে না যায় তা' ঠেকাতে পি-এল-৪৮০-এর আওতায় আমদানীকৃত খাদ্যশস্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের একটা অংশ দিয়ে গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী (Rural Works Programme ; সংক্ষেপে R.W.P.) শুরু করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল মূলতঃ দুটো। এক, মন্দা মৌশুমে কিছু একটা কর্মসংস্থান যুগিয়ে বেকার কৃষিশ্রমিকদের কোনো রকমে টিকিয়ে রাখা। ও দ্বিতীয়তঃ, রাস্তাঘাট তৈরীর মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের যোগাযোগ বাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলে বাজারের (market) সম্প্রসারণ। অবশ্য প্রচারিত লক্ষ্যটা ছিল —গ্রাম-উন্নয়ন। কিন্তু এই 'উন্নয়ন' প্রচেষ্টায় গরীব ও সাধারণ গ্রামবাসীকে যেহেতু কখনই সচেতনভাবে সম্পৃক্ত করা হয়নি, ফলে স্থানীয় সরকারের সঙ্গে আমলাতন্ত্রের যোগসাজশের ফলে এই পরিকল্পনা মূলতঃ দুর্নীতির আখড়া ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা বিতরণেরই বাহন হয়ে দাঁড়ায়।

স্বাধীন বাংলাদেশেও দেখি যেহেতু উফশী আবাদের সম্প্রসারণ করেও গ্রামে কর্মসংস্থানের সমস্যা মোটেই কমানো যাচ্ছে না, তাই দাতা দেশগুলির উদ্যোগ ও পরামর্শে গ্রামাঞ্চলের এ অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি ঠেকা দেওয়ার জন্যে "কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী"

ও "ভিজিএফ" (V.G.F)[৪৩] নামক দুঃস্থদের জন্য খাদ্য কর্মসূচী পরিচালনা করা হ'চ্ছে। এই কর্মসূচী দেশে প্রায় ১০ কোটি শ্রম-দিবস সৃষ্টি করেছে যা প্রতিটি ক্ষেতমজুরের জন্যে গড়ে সৃষ্টি করেছে ১৭ শ্রম দিবস।[৪৪] এছাড়া যে বিশাল পরিমাণের গম ও অর্থ এই কর্মসূচীর জন্য ব্যয় করা হয়, সেসব বিবেচনায় ক্ষেতমজুর আন্দোলনে এই "কাজের বিনিময়ে খাদ্য" কর্মসূচী কিছুটা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

মধ্য-ষাটের দশক থেকেই গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের কিছু কিছু কর্মকাণ্ড দেখা গেলেও সাম্প্রতিককালে "কাজের বিনিময়ে খাদ্য" কর্মসূচী ব্যাপারটি যে একটি বিশেষ মাত্রা গ্রহণ করেছে তা' নীচের সারণীতে এ ব্যাপারে প্রদত্ত খাদ্যশস্যের ক্রমবর্ধমান হার থেকেই বোঝা যায়।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও ভিজিএফ কর্মসূচী

বছর	কাজের বিনিময়ে খাদ্য (হাজার টন)	ভিজিএফ (হাজার টন)
১৯৮০-৮১	৩৪৯	৩.৩
১৯৮১-৮২	৩৬৫	৩.৪
১৯৮২-৮৩	৪১১	৪.৩
১৯৮৩-৮৪	৪৪১	৫.৮
১৯৮৪-৮৫	৫৭০	১৫.৪ (৪৫)

১৯৮৫-৮৬ অর্থবছরে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে খাদ্যশস্য বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ১৫ হাজার টন এবং ১৯৮৬-৮৭ অর্থ-বছরে এ পরিমাণ ৫ লক্ষ ৬০ হাজার টন হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। এ বছরের খাদ্যশস্য বরাদ্দের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার দেবেন ১ লক্ষ টন গম ও চাল। বাকী খাদ্যশস্যের মধ্যে বিশ্ব খাদ্য

৪৩. V G F—Vulnerable Group Feeding.

৪৪. "Development Impact of the Food-for-work Program in Bangladesh" December, 1985, BIDS, পৃ-১।

৪৫. উৎস: World Bank, উদ্ধৃত, "বাংলাদেশের উন্নয়ন সংস্থা", নজরুল ইসলাম, পৃ—৮৩, সারণী-১৮।

কর্মসূচী দেবে ২ লক্ষ ৬০ হাজার টন গম, কেয়ার দেবে ১ লক্ষ ৫ হাজার টন গম এবং ৬৫ হাজার টন গম পাওয়া যাবে ইইসি, পশ্চিম জার্মানী, অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা থেকে। এছাড়া এ বছর দুঃস্থদের খাদ্য প্রদান কর্মসূচী (ভিজিএফ)-এর অধীনে বিতরণের জন্য ১ লক্ষ ৮০ হাজার টন গম বরাদ্দ হয়েছে। গত অর্থবছরে এই কর্মসূচীতে বরাদ্দ ছিল ১ লক্ষ ৫৪ হাজার টন।

কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রদান করা হলেও এর কতখানি প্রকৃতভাবে মাটি কাটার শ্রমিকেরা পেয়ে থাকেন? কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম, দুঃস্থ মাতা প্রকল্প বা টেস্ট রিলিফ এ ধরনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতাটা হ'চ্ছে যে এতদিন গমের সিংহভাগটা গেছে চেয়ারম্যান-মেম্বর ও টাউট-বাটপারদের পেটে। মঞ্জুরীকৃত গমের মাত্র ৭০ ভাগ ক্ষেতমজুরদের হাতে পৌছায়।[৪৬] প্রজেক্টের গম চুরির সঙ্গে ঢাকার সচিবালয় থেকে শুরু করে জেলা-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ের দুর্নীতিবাজ আমলা-নেতাদের এক সুবিশাল চক্র গড়ে উঠেছে। গত কয়েক বছরে ক্ষেতমজুরদের জঙ্গী ও সফল আন্দোলনসমূহের ফলে স্থানীয় পর্যায়ে গম চুরি কিছুটা কমেছে। ইদানীং রেইটের কম গম প্রদান করা প্রজেক্ট কর্মকর্তাদের পক্ষে তেমন সম্ভব হ'চ্ছে না। তাই বর্তমানে তারা প্রজেক্টের এস্টিমেট বাড়িয়ে দেখিয়ে কিম্বা গম গোডাউনে থাকতে থাকতেই কাগজে-কলমের নানা কারচুপির মাধ্যমে চুরির নতুন নতুন সব কায়দা চালু করেছে। তাছাড়া, "কাজের বিনিময়ে খাদ্য" কর্মসূচীর গমের টাকা দিয়ে কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণকাজ করা হ'চ্ছে। গম নিরন্ন ক্ষেতমজুরদের কাছে না যেয়ে চলে যাচ্ছে কন্ট্রাক্টরদের পকেটে যা গ্রামের মুৎসুদ্দী শ্রেণীটার বিকাশ সাধনে সরকার তথা সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী প্রসঙ্গে ক্ষেতমজুর শ্রেণীর আন্দোলনের লক্ষ্য পরিষ্কার। এই গম নিরন্ন ক্ষেতমজুরদের জন্যে

---

৪৬. "Development Impact of the food-for-work Program in Bangladesh", December, 1985, BIDS, পৃ—১।

বরাদ্দ, ফলে এর একটি দানাও পেটমোটাদের পেটে যেতে দেওয়া যায় না। প্রজেক্টের এস্টিমেটের ঘাপলা যাতে না হয় তার জন্য ক্ষেতমজুরদের দাবী প্রজেক্ট কমিটিতে ক্ষেতমজুর প্রতিনিধি রাখতে হবে। রাখতে হবে সর্দারদের জন্যে আড়াই সের ও সুপারভাইজারের জন্য আধা সের পৃথক বরাদ্দ। রাখতে হবে যাতায়াতের খরচের জন্যও পৃথক বরাদ্দ। কোনো অবস্থাতেই শ্রমিকদের অংশ থেকে তা' কেটে নেওয়া চলবে না।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর ক্ষেত্রে বিদেশী নির্ভরশীলতা কমিয়ে আভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবীও তোলা হয়েছে যাতে সাম্রাজ্যবাদের উপর দেশের নির্ভরশীলতা কমানো যায়।

গত কয়েক. বছরে কাজ ও খাদ্যের দাবীতে ক্ষেতমজুররা শত শত উপজেলায় ও জেলা সদরে ঘেরাও, গণডেপুটেশন ইত্যাদি কর্মসূচী পালন করেছে। গম চুরির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতি এ পর্যন্ত ২১২টি স্থানীয় সংগ্রাম করেছে যাতে ১,০০,০০ জন ক্ষেতমজুর অংশ নেয়। ক্ষেতমজুর সমিতির এই দৃঢ় ও লাগাতার আন্দোলনের ফলে গম নিয়ে চেয়ারম্যান-মেম্বরদের পুকুরচুরি কিছুটা কমেছে। প্রজেক্ট কমিটিতে ক্ষেতমজুর প্রতিনিধি রাখা সহ অনেক দাবী স্থানীয় পর্যায়ে মিটেছে। তবুও গম নিয়ে সকল প্রকার দুর্নীতি উচ্ছেদের ক্ষেত্রে এখনও অনেক কিছুই করার রয়ে গেছে।

তবে শ্রেণী রাজনীতির দিক থেকে দেখলে গম চুরির বিরুদ্ধে আন্দোলন মূলতঃ একটা 'পপুলিস্ট' (Populist) আন্দোলন। একটা 'অর্থনীতিবাদ' (Economicism), যাতে ক্ষেতমজুর ছাড়াও গরীব কৃষক, গ্রামীণ মাস্টার, ডাক্তার, ইমাম, অন্যান্য বিভিন্ন পেশার মানুষ, এমনকি গত নির্বাচনে পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান-মেম্বররাও অংশ নেয়, যাদের কেউ কেউ হয়তো শোষকশ্রেণীরই লোক। তাই গমচুরির বিরুদ্ধে আন্দোলন কখনো কখনো খুব জঙ্গী (militant) রূপ নিলেও এই আন্দোলনকে খুব উচ্চ পর্যায়ের আন্দোলন বলা চলে না। তবে গম চুরির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নারী-শ্রমিক, ক্ষেতমজুর ও গ্রামাঞ্চলের গরীব জনগণের মধ্যে যে সাড়া,

উদ্যোগ ও ঐক্যবোধ পরিলক্ষিত হয়েছে তা' খুবই ইতিবাচক এবং তাকে একটা সাংগঠনিক রূপ দিয়ে আগামীদিনে আরো উন্নত আন্দোলনে উন্নীত করার দায়িত্ব ক্ষেতমজুর আন্দোলনের উপর বর্তায়।

তবে গ্রামাঞ্চলে শুধুই রাস্তা-ঘাট নির্মাণের একটা নিজস্ব সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অপরিকল্পিতভাবে রাস্তা নির্মাণের ফলে অনেক ক্ষেত্রে জলাবদ্ধতার সমস্যা দেখা গেছে। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর অধীনে প্রতিবছর গড়ে ১ হাজার মাইল নতুন রাস্তা ও ১৫ হাজার মাইল পুরাতন রাস্তা সংস্কার করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রতিবছর গড়ে ৪০ হাজার ৪০ একর আবাদী জমি কাটা হয় এবং জমি কাটার জন্য জমির মালিকদের কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়না।[৪৭] বলার অপেক্ষা রাখে না যে ধনী ও প্রভাবশালীরা ঠিকই এড়িয়ে যেতে পারে, আর জমি বেশী কাটা পড়ে গরীব কৃষকদের। ফলে গ্রামে গ্রামে শুধুই রাস্তা নির্মাণের বর্তমান প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে কিছু স্থানীয় অসন্তোষও রয়েছে।

প্রসঙ্গ মজুরী ও মজুরী আন্দোলন

ক্ষেতমজুর আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ইস্যু হ'চ্ছে ন্যায্য-মজুরী নিশ্চিত করা। আগামীতে কৃষিতে ধনবাদী সম্পর্কসমূহ যত ছড়াবে, ক্ষেতমজুরের মজুরী-আন্দোলনও তত তীব্র হবে।

সাধারণভাবে ক্ষেতমজুরদের মজুরীর অবস্থা কি? দেখা যায় যে বাৎসরিক ও দৈনিক উভয় প্রকার চুক্তিবদ্ধ ক্ষেতমজুরদের মজুরী মৌসুম, ফসলচক্র, স্থান ও অঞ্চলভেদে বেশ ওঠানামা করে। এই বাংলাদেশেরই কোনো কোনো জেলায়, যেমন কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ভালো মৌসুমে মজুরী ৪০/৪৫ টাকা পর্যন্ত ওঠে (এসব জেলায় বিকল্প, কর্মবিনিয়োগের কিছু সুযোগ থাকায়), আবার এই বাংলাদেশেরই কোনো কোনো জেলায়, যেমন দিনাজপুরে, সারাদিনের

---

৪৭. জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তরে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী মেজর জেনারেল (অবঃ) এম. শামসুল হক এ তথ্য জানান। দৈনিক "সংবাদ", ২৪শে জুন, ১৯৮৭।

শ্রমের পর মজুরী মাত্র ১০ টাকাও রয়েছে।

দৈনন্দিন মজুরীর ক্ষেত্রে মূলতঃ দুই ধারা—পণ্য ও নগদ টাকা। পণ্যে যে মজুরী দেয়া হয় (যেমন একবেলা খাওয়া বা এক সের চাল) তা' মোটামুটি স্থির থাকে, পরিবর্তিত হয় নগদ টাকার মজুরী। মন্দা-মৌশুমে শুধু পণ্য চুক্তিতেও মজুর রাখা হয়। কখনো শুধুই পেটেভাতে। খোরাকি একবেলা, কখনো দুইবেলা। আর এমনিতে আপখোরাকি থাকলে টাকার সঙ্গে মজুরী কিছুটা বাড়ে। নারী ক্ষেতমজুররা খুব সামান্যই মজুরী পেয়ে থাকে। দিনাজপুরের পলিয়া উপজাতির ক্ষেতমজুর নারীরা দিনে ৫/৭ টাকার বেশী মজুরী পান না, যদিও তারা কাজ করেন পুরুষ ক্ষেতমজুরদেরই সমান। আর শিশুদের শ্রম তো প্রায় সর্বত্রই নেয়া হয় ফাও হিসাবে, প্রায় বিনামূল্যেই।

সরকারের হিসেবে বলা হয় যে ১৯৭২-৭৩ সালের তুলনায় কৃষি-মজুরীর হার ৯৫% বেড়েছে। কিন্তু অর্থনীতিবিদদের মতে, বিশেষ করে এ. আর. খান যে হিসেবে দিয়েছেন তাতে আমরা দেখি যে টাকার অঙ্কে (money-wage) মজুরী কিছুটা বাড়লেও প্রকৃত মজুরী (real-wage) বাড়ে তো নাই-ই, বরং—কমেছে। টাকার অঙ্কে যে বেড়েছে তা' নীচের সারণীতে প্রমাণ,

কৃষি মজুরের দৈনিক মজুরী

বৎসর	মজুরী (সমকালীন টাকায়)
১৯৭২-৭৩	৫·৭২
১৯৭৩-৭৪	৬·৬৯
১৯৭৪-৭৫	৯·০৫
১৯৭৫-৭৬	৮·৮২
১৯৭৬-৭৭	৮·৯৩
১৯৭৭-৭৮	৯·৪৪
১৯৭৮-৭৯	১০·৮৮
১৯৭৯-৮০	১২·৪৬
১৯৮০-৮১	১৩·৯০ [৪৮]

৪৮. উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৮১, পৃ—৪২১।

কিন্তু এর সঙ্গে যদি আমরা চাল-ডাল-তেল সহ অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য হিসেব করি তা'হলে দেখব যে ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে কৃষি-মজুরীর হার ১৯৫% বাড়লেও ভোক্তার মূল্যসূচকও একই হারে, বরং বেশীই, বেড়েছে। নীচের সারণীটি থেকে তা' বোঝা যাবে,

মজুরী

সাল	টাকা	চাল
১৯৭২-৭৩	৪·৭২	২·১০ সের
১৯৮০-৮১	১৩·৯৭	২·৬ ,,
১৯৮১-৮২	১৫·৬৬	২·৩ ,,
১৯৮২-৮৩	১৫·১০	২·১[৪৯] ,,

অথচ দেখছি অর্থমন্ত্রী সাইদুজ্জামান তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলছেন যে ক্ষেতমজুরদের আয় উর্ধ্বমুখী। এই ফাঁকাবুলির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ ফরহাদ বাজেটের সমালোচনামূলক বক্তৃতায় এই তথ্য দিচ্ছেন যে, "ক্ষেতমজুরদের আয়ের ক্ষেত্রে ১৯৮১-৮২ সালে সূচক ছিল ৮৬ এবং ১৯৮৬-৮৭-তে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮৭-তে। বৃদ্ধি যা পেয়েছে তা মাত্র ১%। মুদ্রাস্ফীতির হার ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি ধরলে তা' কিছুই নয়। বরং ১৯৭০ কে ১০০ ভিত্তি ধরলে বা খাদ্য ধরে হিসাব করলে এক ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যাবে।"[৫০]

সরকার যে বলার চেষ্টা করছে ক্ষেতমজুরদের মজুরী বেড়েছে তা' বস্তুতঃ কিছুই নয়। বরং কৃষিমজুরী ১৯৭০ সালের তুলনায় ১৯৮৫-তে প্রায় ৮% এবং আর এ-আর খানের হিসেবে গত ১০ বছরে ১৫% কমেছে। আর আমরা যদি আরো পেছনে তাকাই তা'হলে দেখব

---

৪৯. উৎস : বাংলাদেশ স্টাটিসটিক্যাল পকেট বুক।

৫০. জাতীয় সংসদে মোহাম্মদ ফরহাদের বাজেট বিষয়ক বক্তৃতা শিরোনাম "মুৎসুদ্দী লুটেরাদের বাজেট, সরকারের ব্যর্থতার দলিল", সাপ্তাহিক "একতা", ২৬/৬/৮৭।

যে, ১৮৩০ সালে ময়মনসিংহের একজন দক্ষ ক্ষেতমজুরের মজুরী ছিল ৯'৪৬ সের চালের সমান, ১৮৩০ থেকে ১৯৩০ সালে এই ১০০ বছরে তা' কমে ৫'৩৫ থেকে ৬'০৪ সেরের মাঝে ওঠানামা করেছে। আর পঞ্চাশ বছর পর ১৯৮০ সালে তা' কমে ২'৬ সের চালে এসে ঠেকেছে।

অবশ্য সাম্প্রতিককালে উপজেলার দালান-কোঠা, রাস্তা-ঘাট, কণ্ট্রাক্টরের নানা রকম নির্মাণ কাজ, রিক্সা-ভ্যান ইত্যাদি অবকাঠামোগত কাজের সুযোগ বৃদ্ধির ফলে গ্রামাঞ্চলে মজুরী যৎসামান্য বেড়েছে। কিন্তু গ্রামে মজুরীর হার বৃদ্ধি ও ক্ষেতমজুরের মজুরী বৃদ্ধি এক জিনিষ নয়, যে ভাঁওতাটা জেনারেল এরশাদ সম্প্রতি সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণে দিয়ে কৃতিত্ব নিতে চেয়েছেন। বস্তুতঃ ক্ষেতমজুরের মজুরী বৃদ্ধির বিষয়গত ভিত্তি কৃষি-অর্থনীতিতে এখনও অনুপস্থিত, বরং তাঁর মজুরী কমার কারণসমূহ আগের মতই রয়ে গেছে, বরং বাড়ছে। যেমন জমি-মানুষ অনুপাতের ক্রমহ্রাসমানতা, ভূমি-মালিকানা বন্টনে বৈষম্য এবং তার অনিবার্য্য সৃষ্টি নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া, অনুপযুক্ত প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অকৃষি খাতে কৃষির উদ্বৃত শ্রমশক্তি ব্যবহৃত না হওয়া।

কৃষিতে ধনবাদ ত্বরান্বিত হলে কৃষিমজুরী বাড়বে এ রকম একটা ধারণা কোনো কোনো মহল থেকে দেয়া হয় এবং উদাহরণ হিসেবে আইয়ুবী আমলটাকে টানা হয় যেখানে ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত মজুরী ২'৯০ সের মোটা চাল থেকে ৩'৮৯ সের, প্রায় এক সের বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে কোনো কোনো মহল থেকে বলা হয়।

তবে এ. আর. খান আবার তথ্য দিচ্ছেন যে ওই সময়কালটাতে কৃষি-মজুরী মূলতঃ কমেছেই, কারণ কৃষির মজুরীর সূচক ছিল

সন	সূচক
১৯৫৮	১০১'০
১৯৬২	১১৩'০
১৯৬৬	১০০'০([৫১])

৫১. A. R. Khan, "Poverty and Inequality in Rural Bangladesh". পৃ—২১

বিতর্কের জটিলতায় না যেয়েও বলা যায় যে মজুরী যদি কিছুটা বেড়েও থাকে বর্তমানে তা পুনঃঘটিত হওয়ার তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। কারণ, প্রকৃত মজুরী বাড়াতে যে উচ্চহারে কৃষি উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে তা' বর্তমান কৃষি কাঠামো বজায় রেখে সম্ভব নয়। তাছাড়া শুধুমাত্র উৎপাদনশীলতা বাড়ালেই মজুরী বাড়বে না। আইয়ুবী আমলেও শুধুমাত্র সে কারণেই বাড়েনি। অন্যান্য বেশ কিছু আভ্যন্তরীণ শর্তও সৃষ্টি হয়েছিল যা বর্তমানে পুনরাবৃত্ত হওয়া তেমন সম্ভব নয়। এ ছাড়া বর্তমান আন্তর্জাতিক বাজার-কাঠামোতে কৃষিপণ্যের দাম সুনিশ্চিত করা প্রায় অসম্ভব। গত দুই বছর কৃষক পাটের কোনো দাম পায়নি। অন্যান্য অর্থকরী ফসলের ব্যাপারেও অবস্থা অথৈবচ। ফলে কৃষিমজুরী অনিশ্চিতই থেকে যাচ্ছে।

তবে আর সব কিছুর মত মজুরীর ক্ষেত্রেও এসব বিষয়গত (Objective) উপাদান ছাড়াও কিছু বিষয়ীগত (Subjective) উপাদানও ক্রিয়াশীল রয়েছে। ক্ষেতমজুর সমিতির সাধারণ সম্পাদক যে দাবী করেছেন যে, ১৯৮২, '৮৫, '৮৬-তে কোথাও কোথাও মজুরী যে গড়ে ১০% ও মৌসুমে ২০% বেড়েছে[৫২] তার এক বড় কারণ গত কয়েক বছরে মজুরী প্রশ্নে ক্ষেতমজুর সমিতির ব্যাপক প্রচার, সমাবেশ ও আন্দোলন। দেশের ৭৮টি স্থানে সংগঠিতভাবে মজুরীর সংগ্রাম হয়েছে।[৫৩]

অবশ্য এটা সবাই বোঝেন যে, কারখানার শ্রমিকদের মত ক্ষেতমজুরদের মজুরী-আন্দোলন অত সরল নয়। বছরের বিভিন্ন সময় তারা বিভিন্ন রকম কাজ করে। ফলে নিয়োগকর্তাও হয় বিভিন্ন। কখনো জমির মালিক, কখনো ইটের ভাঁটা বা রাইসমিলের মালিক, কখনো কন্ট্রাক্টর, আবার কখনো বা মাটি কাটার প্রকল্প-চেয়ারম্যান। ফলে বছরের বিভিন্ন সময়েই আন্দোলনের প্রেক্ষিতটা

---

৫২. বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের রিপোর্ট, ১৯৮৬, পৃ-১৭।

৫৩. ঐ, পৃ-১৮।

পাল্টে যায়। এছাড়া শুধুমাত্র মাটি কাটার কাজ বা ভরা মৌশুমেই তারা যৌথভাবে কাজে নিয়োজিত হয়, ফলে শুধুমাত্র তখনই যৌথ দর-কষাকষির সুযোগ সৃষ্টি হয়। যখন একজন ক্ষেতমজুরকে একক-ভাবে কর্মে নিয়োগ করা হয়, তখন মজুরী প্রশ্নে তার আন্দোলনের তেমন কোনো সুযোগই থাকে না।

বস্তুতঃ গমচুরি, ইজারাদারী বা সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চেয়ে মজুরীর সংগ্রাম অনেক উচ্চ পর্যায়ের আন্দোলন। এর জন্যে প্রয়োজন খুবই সুসংগঠিত ও সচেতন সংগঠন, কর্মী ও বুঝদার স্থানীয় নেতৃত্ব। গ্রামের বিভিন্ন সামাজিক বর্গের শক্তির ভারসাম্যকে এক্ষেত্রে বিবেচনায় নিতে হবে। যেমন গরীব কৃষকের সঙ্গে মৈত্রীর বৃহত্তর বিবেচনা মনে রেখে তার জমিতে স্বল্প মজুরীতে কাজ করা যেতে পারে, কিন্তু মজুরী প্রশ্নে সরকারী কাজ, কন্ট্রাক্টরের কাজ, ইটের ভঁাটা, রাইসমিল বা বড় জোতদারের কাজে কোনোই ছাড় দেয়া ঠিক হবে না। ক্ষেতমজুরের মজুরীর আন্দোলনে তখনই সফলতা আসবে যখন একটি গোটা গ্রাম বা চারপাশের গ্রামপুঞ্জ মজুরী প্রশ্নে যৌথভাবে সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ ও আপোষহীন হবে। এক্ষেত্রে মজুরীর প্রশ্নে দর কষাকষির জন্যে স্থানীয় গ্রাম সমিতি-গুলিকে ক্রমান্বয়ে শ্রমিকদের সিবিএ (Collective Bargaining Agent)-র পর্যায়ে তুলে আনতে হবে। মজুরীর প্রশ্নে সকল দর কষাকষি হবে একক নয়—যৌথভাবে।

নিম্নতম মজুরী অর্ডিন্যান্স প্রসঙ্গে

প্রথমেই বলে নেয়া প্রয়োজন যে নিম্নতম মজুরী ও ন্যায্য মজুরী এক জিনিষ নয়। ন্যায্য তো সবই। মজুরের শ্রম ছাড়া কিছুই উৎপাদিত হয় না। গোলার সব ধানই ক্ষেতমজুর দাবী করতে পারে। সেটা করা হ'চ্ছে না আপাততঃ। যেটা চাওয়া হ'চ্ছে তা' হচ্ছে প্রতিদিন শ্রমের ফলে শরীরের যেটুকু ক্ষয় হয়, কেতাবী ভাষায় শ্রম পুনরুৎপাদনের জন্য, ক্ষেতমজুরকে শারীরিকভাবে সুস্থ

রাখার জন্যে, ন্যূনতম যেটুকু প্রয়োজন, সেটাই নিম্নতম মজুরী। বর্তমানে প্রচলিত ক্ষেতমজুরের মজুরী তার শ্রমশক্তির মূল্যের মাত্র অর্ধেক। এই মজুরীতে ক্ষেতমজুরের পক্ষে তার শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদন সম্ভব নয়।[৫৪] সে হিসেবেই ক্ষেতমজুর সমিতি ক্ষেতমজুরদের জন্য দৈনিক নিম্নতম মজুরী হিসাবে চার সের চাল বা সমপরিমাণ অর্থের দাবী তুলেছে। গত কয়েক বছরে দেশব্যাপী ক্ষেতমজুর সমিতির সফল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৯৮৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী সরকার ক্ষেতমজুরদের জন্য একটা "নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশ" (অধ্যাদেশ নং—১৭/১৯৮৪) জারী করেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে বর্তমান আমলা-মুৎসুদ্দী পুঁজির সামরিক সরকার হঠাৎ করে ক্ষেতমজুরদের প্রতি এ ধরণের একটা দরদী আইন গ্রহণ করতে পারল কি করে? উত্তরটা হ'চ্ছে এ সরকার পারে কারণ সরকারের শ্রেণী-চরিত্রটা নাগরিক ও আমলা-মুৎসুদ্দী। গ্রামে ভিত্তি নেই বলে ঝুঁকিও (stake) কম (তাছাড়া সরকার জানে যে এটা অবাস্তব এবং এই আইন একটা কাগুজে আইন হয়েই থাকবে)। কিন্তু সরকার শহুরে গৃহভৃত্যদের জন্য নিম্নতম মজুরীর আইন করুক দেখি! সবাই বোঝেন যে এ ধরণের সরকারের পক্ষে তা' অসম্ভব। সরকার শহুরে উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের চটাতে পারবে না, কারণ এই শ্রেণীগুলিই সরকারের মূল ভিত্তি। আর তাইতেই দেখি শহরের রাষ্ট্রীয় খাতের শ্রমিকদের বেলায় সরকার নিম্নতম মজুরী নির্ধারণে বাধ্য হয়েছে (তাও ৪৮ ঘণ্টা ধর্মঘটের পর), কিন্তু ব্যক্তিখাতের শ্রমিকদের বেলায় সেরকম কোনো আইনই নেই।

যাহোক, সরকারের ভূমি-সংস্কার ও আইন মন্ত্রণালয়ের একটি "বিশেষ গেজেট বিজ্ঞপ্তি"-র মাধ্যমে এই ন্যূনতম মজুরী অর্ডিন্যান্স ১৯৮৪ জারী করা হয়। অধ্যাদেশে বলা হয়েছে যে কৃষিশ্রমে নিয়োজিত ব্যক্তিদের নিম্নতম মজুরী ৩'২৭ কিলোগ্রাম (সাড়ে তিন সের) চাল বা স্থানীয় বাজারে সমপরিমাণ চালের দামে মজুরী দেয়া হবে।

---

৫৪. ঐ, পৃ-১৭।

তবে সরকারের এই গেজেট নোটিফিকেশনে প্রথমেই রয়েছে ধাপ্পা। সরকার অন্যদের জন্য এই নিম্নতম মজুরীর আইন করেছেন, কিন্তু যেখানে সরকার নিজে নিয়োগকর্তা সেখানে এই আইন তার নিজের উপর বলবৎ নয়, একথা বলে নিচ্ছেন! বলা হয়েছে, এই আইন কৃষিশ্রমে নিয়োজিত যে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, কিন্তু "সরকারের দ্বারা নিয়োজিত কেউ" এর আওতায় পড়বে না !!

এই আইন ভঙ্গকারীর শাস্তির বিধান হিসাবে বলা হয়েছে কেউ যদি সাড়ে তিন সের চালের কম মজুরী দেয়, তার গ্রাম্য-আদালতে বিচার হবে এবং তাকে ক্ষতিগ্রস্থকে দ্বিগুণ মজুরী ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কিন্তু বাস্তবে এই গ্রাম্য আদালত কাদের নিয়ে গঠিত হবে, কী নীতিমালার ভিত্তিতে তা' কাজ করবে, এসব ব্যাপারে অধ্যাদেশে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। ফলে দেশের সর্বত্রই ক্ষেতমজুরদের সাড়ে তিন সেরের অনেক কম মজুরী নিয়েই জমির মালিকেরা খাটিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু সে-কারণে কারো কোনো গ্রাম্য-আদালতে বিচার হয়েছে, এমন কথা কেউই শোনেনি! বস্তুতঃ এটা সবাই বোঝেন যে গ্রামাঞ্চলে লেবার কোর্ট, লেবার ইনস্পেক্টর ও ক্ষেতমজুর-দের যৌথ দর-কষাকষির অধিকার না থাকলে এ জাতীয় কাগুজে আইন অর্থহীন। তাছাড়া আগেই বলেছি নিম্নতম মজুরী ৩½ সের চাল কোনোই সুবিচার নয়, কারণ অনেক জায়গাতেই মৌসুমের সময় এমনিতেই ক্ষেতমজুররা ৩½ সের চালের বেশী মজুরী পেয়ে থাকেন।

আর শুধু নিম্নতম মজুরীর আইনই যথেষ্ট নয়। কোথায় ওভার-টাইম ও অসুস্থকালীন সবেতন ছুটির বিধান? জিনিষপত্রের দাম প্রতিদিনই যে হারে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, তার জন্যে কোথায় মহার্ঘ্য ভাতা? কর্মচারী ও শ্রমিকদের জন্য পে-কমিশন রয়েছে, কিন্তু দেশের বৃহত্তম শ্রমবাহিনী ক্ষেতমজুরের জন্য পে-কমিশন কোথায়? আসলে এই অধ্যাদেশে সরকারের উদ্দেশ্য ক্ষেতমজুরদের দুর্দশা লাঘব নয়। উদ্দেশ্য ছিল দেশে-বিদেশে ভাঁওতামূলক প্রচার চালিয়ে সরকারের ভাবমূর্তি বাড়ানো ও সামনের নির্বাচনকে মনে

রেখে গ্রামের গরীবদের ভোটকে আকর্ষণ করা।

তবে ক্ষেতমজুরদের একটি দাবী এই প্রথমবারের মত জাতীয় স্বীকৃতি পেল, তাই এখনও এই আইন একটা কাগুজে আইন রয়ে রইলেও এর একটা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে বৈকি।

বিশ্বব্যাঙ্ক ও সাম্রাজ্যবাদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী সরকারের যে কৃষিনীতি তার অন্যতম মূল লক্ষ্য হ'চ্ছে ক্ষেতমজুরের শ্রমকে মজুরী শ্রমে পরিণত করা, যা কৃষিতে পুঁজিবাদী সম্পর্ককে তরান্বিত করবে। সেই আলোকে দেখলে ক্ষেতমজুরের মজুরীর আন্দোলনটি একটি জটিল ও বহুপল্লবিত বিষয়। আমরা আগেই বলেছি যে একই গ্রামে মজুরীর হার একই সময় দুইরকমও দেখেছি। এখানে চাহিদা ও সরবরাহের বাজারনীতি ছাড়াও ক্ষেতমজুর শ্রেণীর সচেতন দিকটি ও সাবজেক্টিভ বিবেচনাবোধটাও অন্তর্ভূক্ত। এছাড়া ক্ষেতমজুরের শ্রম যে এখনও পুরোপুরি পুঁজিবাদী পণ্য হয়ে ওঠেনি এটা তারও প্রমাণ। খুলনার মোংলায় দেখেছি ধান কাটার সময় ধনীর মজুরী ৮ আঁটিতে ১ আঁটি, আর বিধবা ও গরীবদের জন্যে ৯ আঁটিতে ১ আঁটি। যেহেতু ক্ষেতমজুরের শ্রম এখনও পুরোপুরি পুঁজিবাদী এক পণ্য হয়ে উঠতে পারেনি ফলে এসব বিষয়ীগত (subjective) দিকগুলোও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।

এক ক্ষেতমজুর সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন একজন পুরনো স্থানীয় কৃষক নেতা সিরাজ মিয়া। সিরাজ মিয়া মাঝারি কৃষক। কৃষক আন্দোলন করতে যেয়ে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষাও করেছেন। চার সের চাল মজুরীর উপর বক্তৃতা করার পর সভায় কিছুক্ষণ নীরবতা। বুঝলাম ক্ষেতমজুররা কিছু বলতে চান। কিন্তু কেউ মুখ খুলছেন না। বারবার বলার পর একজন ক্ষেতমজুর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চার সের চাল মজুরী তো খুব ভাল কথা। কিন্তু সিরাজ মিয়া কি তা' দেবেন ? আমরা তো ওর জমিতেও কাজ করি!"

বস্তুতঃ মাঝারি কৃষকের সঙ্গে ক্ষেতমজুরের মজুরীর এই দ্বন্দ্বটি ক্ষেত-মজুর আন্দোলনের অন্যতম মূল, জটিলতম ও প্রধান (key) প্রশ্ন। গ্রামের বিদ্যমান শক্তির ভারসাম্যের কথা বিবেচনায় রেখে এ প্রশ্নের

একটা যথার্থ উত্তরের উপরই আগামীদিনের ক্ষেতমজুর আন্দোলনের দিক্‌সীমা নির্ভর করছে। আর আমরা আগেই বলেছি যে এ ব্যাপারে ক্ষেতমজুর শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীটা অবশ্যই হতে হবে দ্বান্দ্বিক।

অবশ্য নিম্নতম মজুরী নিশ্চিত করার সংগ্রামটি সব সময়ই কঠিন। ১৯৭৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আইন করেছিল নিম্নতম মজুরী হবে ভারতীয় ৮ টাকা ১০ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট সরকার, তবুও ১৯৭৯ সালের এক জরীপে দেখা গেল যে ক্ষেতমজুরদের বৃহত্তম অংশই তা পা'চ্ছে না। বস্তুতঃ ক্ষেতমজুরদের নিম্নতম মজুরী নিশ্চিত করতে নীচের দিকে লাগাতার আন্দোলনের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে "ক্ষেতমজুরদের নিম্নতম মজুরী কাউন্সিল"-এ ক্ষেতমজুর প্রতিনিধি রাখা সহ, গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র, ক্ষেতমজুর সংগঠনের দৃঢ় ও সচেতন উপস্থিতি ছাড়া, তা' সম্ভব নয়।

খাস জমি সমাচার

দেশে বর্তমানে মোট প্রায় ১২ লক্ষ একর খাস জমি রয়েছে। খাস জমির মুল উৎসগুলো হ'চ্ছে সেই জমিদারী আমল থেকে যেসব জমি খাসমহালের জমি হিসেবে চিহ্নিত, উপকূলীয় অঞ্চলে নতুন ভূখণ্ড হিসাবে জেগে ওঠা জমি, নদী-পয়োস্তি, নদী-শিকস্তি ও নদীর চর হিসেবে জেগে ওঠা জমি, হাওড় এলাকার বিস্তীর্ণ জমি। যেমন শুধুমাত্র সুনামগঞ্জ জেলাতেই আছে ৫৩,০০০ একর খাস জমি। এসব মুল উৎস ছাড়াও আরো যেসব সূত্রের জমি খাস জমি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, তা' হ'চ্ছে, পার্বত্য এলাকার অনাবাদী জমি, বনাঞ্চলের জমি, সিলিং উদ্বৃত্ত জমি, রেলওয়ে বিভাগের জমি।[৫৫]

স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকার এক পি. ও. অর্ডারের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে দেশের সকল খাসজমি ভূমিহীনদের প্রাপ্য। এর মধ্যে নদী শিকস্তি, নদী পয়োস্তি, সিলিং-উদ্বৃত্ত,

---

৫৫. "খাস জমির আন্দোলন: তাৎপর্য্যপূর্ণ নতুন পর্যায়", মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাপ্তাহিক "একতা", ১লা মে, ১৯৮৭।

চরাঞ্চল ও বনাঞ্চলের জমি ছিল। কিন্তু সে সময় আমরা দেখি যে ভূমিহীনদের চাইতে স্থানীয় বিত্তবান টাউটেরাই নানা ভূঁয়ো ভূমিহীন সমিতি বানিয়ে এসব খাস জমি দখল নিয়েছে। এমন ঘটনাও দেখেছি যে ক্ষেতমজুর ওই জমির উপর দিয়ে সকাল-বিকাল হাঁটে, কিন্তু জানে না ওই জমি তার নামে দখলী নেয়া! কবে কোন্ সাদা কাগজে টিপসই দিয়ে কাকে সে জমি পাইয়ে দিয়েছে, সে নিজেই জানে না! এমন ঘটনার কথাও জানি যে ক্ষেতমজুর ভাই ওই জমিতেই পাঁচ-দশ টাকায় মজুর খাটে, কিন্তু জানেনা যে কাগজে-কলমে ওই জমি তারই নামে পত্তন নেয়া !!

বস্তুতঃ শতকরা আশি ভাগ ক্ষেত্রেই খাসজমিগুলি স্থানীয় টাউট-বিত্তবানেরা খেয়ে আসছে। এসব জমির ব্যাপারে স্থানীয় ধনিক শ্রেণী ও দুর্নীতিবাজ প্রশাসন কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি কায়েমী স্বার্থ গড়ে উঠেছে। একই জমি একাধিক ব্যক্তির নামে বরাদ্দ দিয়ে সংঘাত বজায় রাখা হয়েছে। ফী বছর ঘুষ নেয়া যাবে, এই মতলবে তহশীল অফিসগুলো ইচ্ছাকৃতভাবেই খাস জমির ঘাপলাগুলো টিকিয়ে রেখেছে। এই জমিগুলো তাদের সোনার হাঁস যা প্রতি বছরই তাদের জন্য কিছু বেআইনী অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেয়।

নদীর তীর ও চরাঞ্চলে বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষ একর খাসজমি রয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এসব জমির অধিকাংশই ভোগ করছে স্থানীয় ধনী ও প্রভাবশালীরা। আর চরের জমির ক্ষেত্রে তো জঙ্গলের আইন। লাঠি যার, জমি তার। বড় বড় জোতদারেরা জমিগুলো নিজেদের দখলে এনে ফায়দা লুটছে। কিন্তু দখলে আনতে আবার একদল অসহায় ভূমিহীনকে আরেকদল অসহায় ভূমিহীনের বিরুদ্ধে লাঠালাঠির দ্বারা মাথা ফাটানোর কাজে ব্যবহার করছে। আর উপকূলীয় জমি তো শুধু পত্তনী দিলেই চলে না, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, মিষ্টি পানির নলকূপ ইত্যাদি জীবন-ধারণের নিম্নতম নিরাপত্তা ছাড়া তা' অর্থহীন হয়ে পড়ে। আর সামাজিক মানুষের উপযোগী অবকাঠামো, যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইত্যাদি তো এখনও স্বপ্ন। বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলের খাসজমি বিনা সেলামীতে ভূমিহীনদের

মাঝে বিতরণের সরকারী ঘোষণার কিছুটা নোয়াখালীর চরাঞ্চলে কার্যকর হয়েছিল। কিন্তু চাষাবাদের জন্য ভূমিহীনদের পর্যাপ্ত ঋণ না দেয়ায় যারা জমি পেয়েছিলেন, তারা অনেকেই জমি ধরে রাখতে পারেননি। জমি হাতছাড়া হয়ে যায়।[৫৬]

দেশে বর্তমানে মোট ৯,৫৭৫ হাজার বর্গমাইল বনভূমি রয়েছে। এমনিতে ফরেস্ট বিভাগের দুর্নীতিবাজ কর্মচারীদের সহায়তায় ফড়ে-ব্যবসায়ীরা দেদারভাবে বনের মূল্যবান কাঠ ও অন্যান্য সম্পদ ট্রাক-কে-ট্রাক উজাড় করে চলেছে। কিন্তু দরিদ্র মজুর এক টুকরো জ্বালানি কাঠ সংগ্রহে জঙ্গলে ঢুকলে তাকে নানা রকম নির্যাতন ও হয়রানীর শিকার হতে হয়। তাছাড়া বনভূমির প্রান্তসীমায় বা আভ্যন্তরীণ অপেক্ষাকৃত নীচু এলাকায় ধানী জমির ক্রমান্বয় সম্প্রসারণের দ্বারা বনভূমির বিপজ্জনক গ্রাসকরণ চলছে। ক্ষেতমজুর সমিতি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিসহ অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠনের দীর্ঘদিনের দাবী এই যে জমির সিলিং এক ফসলী ৫০ বিঘা ও দুই ফসলী ৩০ বিঘা করে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হোক। আজ যখন বর্তমান সরকারের ঘোষণার ফলে খাস-জমি আন্দোলনের ফলে একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তখন স্থানীয়ভাবেই দাবী উঠছে শুধু খাসজমি নয়, সিলিং-উদ্বৃত্ত জমিও বিলি করা হোক। এই দাবীকে জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দাবীটা হ'চ্ছে সিলিং উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া নিশ্চিত করার জন্য এক মালিকের জমি এক খতিয়ানভুক্ত করে পুনরায় জমির জরীপ সম্পাদন করতে হবে। ১৯৭৭ সালের ভূমি-জরীপ অনুযায়ী সিলিং ৩০ বিঘা ধরলে মোট ১৪,৪৪,০০০ একর উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যাবে বলে ধারণা করা যায়। এ জমি বসতবাড়ীর অধিকারী ভূমিহীন পরিবারগুলোর মাঝে বিতরণ করলে পরিবার পিছু জোতের আয়তন ১½ বিঘার মত হয়। তবে এক্ষেত্রে এক বাস্তব সমস্যা বিদ্যমান। তা' হ'চ্ছে জমির এ ধরণের গড়পড়তা বণ্টন সম্ভব নয়। কারণ সেক্ষেত্রে গ্রাম, উপজেলা,

---

৫৬. অজয় রায় "বাংলাদেশের ভূমি-ব্যবস্থা, সমস্যা ও সমাধান", পৃ—৩৩।

এমনকি এক জেলা থেকে অন্য জেলায় ভূমিহীন পরিবারদের স্থানান্তর করতে হবে।

সেক্ষেত্রে ক্ষেতমজুর সমিতির দাবী যে সকল রকম খাসজমি, চর, উপকূল, বনাঞ্চল, সিলিং-উদ্বৃত্ত, নদী-পয়োস্তি, নদী-শিকস্তি ইত্যাদি জমি, বিক্রয় ও হস্তান্তর অযোগ্য শর্তে, বিনা সেলামীতে সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষেতমজুরদের মধ্যে বিতরণ করা হোক। সমবায়ের দাবী খুবই বোধগম্য। বিনা সেলামীতে, কারণ সেলামী দেয়ার পয়সা ক্ষেতমজুরের নেই। এ সম্পর্কিত কোনো দুর্নীতিও কাম্য নয়। আর হস্তান্তর অযোগ্য শর্তে—কারণ দারিদ্র্যের যে প্রান্তসীমায় ক্ষেত-মজুরের অবস্থান সেখানে জমি পেলেও অর্থাভাবে সে জমি সে বিক্রি করতে বা বন্ধক দিতে বাধ্য হয়ে পড়বে। জমি যাতে আবার তার হাত-ছাড়া না হয়ে যায়, সে কারণেই "হস্তান্তর অযোগ্য" শর্তটি গুরুত্বপুর্ণ।

খাস জমি প্রসঙ্গে "খোদ কৃষকের হাতে জমি ও সমবায়" এই নীতির ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে আমূল ভূমিসংস্কার ও কৃষি-সংস্কার সাধনের দাবীর পাশাপাশি ক্ষেতমজুর শ্রেণীর এটা খুবই জরুরী এক দাবী যে দেশের প্রতি ছটাক খাস জমি তার ন্যায্য আইন-গত পাওনা এবং তার একটি ধুলিকণাও সে ধনিকদের ভোগ করতে দেবে না।

এই সার্বিক পটভূমিটা মনে রেখেই সম্প্রতি এরশাদ সরকার ভূমিহীনদের খাসজমি প্রদানের যে কর্মসূচী (ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭) ঘোষণা করেছে তা' বিশ্লেষণ করা যাক্। ১৯৭২ সালের পর খাস-জমি ভূমিহীনদের মাঝে স্থায়ী বন্দোবস্তের লক্ষ্যে কিছু কাগজ বিতরণ শুরু হয়। পরে অবশ্য কায়েমী স্বার্থবাদীদের চাপে তা' বন্ধ হয়। জিয়াউর রহমানের সময় খাসজমির স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা বাতিল করে বছর বছর ডিসিআর কেটে বন্দোবস্ত দেয়ার প্রথা চালু করা হয়। এ প্রথা গত বছর পর্যন্ত চালু ছিল। বর্তমানে এরশাদ সরকার খাস জমি বিতরণের যে সরকারী নির্দেশাবলী দিয়েছে, এখন তার মূল মূল বিষয়গুলো একবার দেখা যাক্;

(ক) দেশে প্রায় ৮ লক্ষ একর খাস জমি রয়েছে বলে ভূমি মন্ত্রণা-

লয়ের সচিব এম. মোকাম্মেল হক তথ্য দিয়েছেন।[৫৭]

(খ) কেবল ভূমিহীনেরা জমি পাবে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে।

(গ) উপযুক্ত ক্ষেত্রে ভূমিহীনদের সমবায়ের নিকট জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হবে।

(ঘ) বসতবাড়ীর জন্যে বিশেষভাবে জমি দেওয়া হবে।

(ঙ) সেচ সুবিধাপ্রাপ্ত দেড় একর জমি (১'৫ একর), সেচ সুবিধাপ্রাপ্ত নয় এমন দুই একর জমির সমান বলে বিবেচিত হবে।

(চ) ২'০০ একর বা ততোধিক খাস জমি একত্রে থাকলে তা ভূমিহীন কৃষক সমবায় সমিতির নিকট বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। সেচ সুবিধা প্রাপ্ত এলাকায় সদস্য প্রতি সর্বোচ্চ ২ একর এবং সেচ সুবিধা প্রাপ্ত নয় এমন এমন এলাকায় সর্বোচ্চ ২'৫ একর (আড়াই একর) বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। চর এলাকায় জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে নদী ভাঙ্গা ভূমিহীন কৃষক সমিতির সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

(ছ) ভূমিহীন কৃষক সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত নয় এমন ভূমিহীনদের ক্ষেত্রে সেচ সুবিধা প্রাপ্ত এলাকায় সর্বোচ্চ ১'৫ (দেড়) একর এবং সেচ সুবিধা প্রাপ্ত নয় এমন এলাকায় সর্বোচ্চ ২ একর জমি বন্দোবস্ত দেয়া হবে।

(জ) বসত বাড়ীর জন্য সমিতির সদস্যদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সদস্য প্রতি অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ৫ কাঠা জমি বন্দোবস্ত দেয়া যেতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে মসজিদ, উপাসনালয়, কবরস্থান, শ্মশান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিকল্পিত স্থানে উপযুক্ত জমি বরাদ্দ করা যেতে পারে।

(ঝ) একর প্রতি এক টাকা সেলামী ধার্য করা হয়েছে।

(ঞ) উত্তরাধিকার সূত্র ছাড়া জমি বন্দোবস্ত প্রদানের ১৫ বছরের মধ্যে জমি হস্তান্তর করা যাবে না।

---

৫৭. দৈনিক "সংবাদ" ২৬শে এপ্রিল, ১৯৮৭।

(ট) পিতা-মাতার মালিকানায় জমি থাকলে, পুত্র-কন্যার অনুকূলে জমি থাকলে, বন্দোবস্ত দেয়া চলবে না।

(ঠ) বিদেশী সাহায্য সংস্থা বা এনজিও-দের মাধ্যমে খাস জমি বিতরণ করা হবে। ভূমিহীনকে বাধ্যতামূলক কোনো না কোনো এনজিও-র গ্রুপ বা সমিতির সদস্য হতে হবে। অন্যথায় সে জমি পাবে না। এনজিও-দের মাধ্যমে তিন কপি যুগল ছবিসহ বেশ জটিল একটা ফর্ম পূরণ করতে হবে এবং খাস জমি পেয়ে যাবার পরেও খাস জমিতে পুনর্বাসিত ভূমিহীন-ক্ষেতমজুররা দু'বছরের মধ্যে কোনো এনজিও-র সদস্য হতে ব্যর্থ হলে বন্দোবস্তটা বাতিল করা হবে।

(ড) কৃষি কাজের জন্য জমি অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

(ঢ) দরখাস্ত জমা নেওয়ার জন্য ঢোল-মহরত সহ ব্যাপক প্রচার চালানো হবে।

(ণ) বন্টন ও বাছাই কমিটি পুর্বে অবগত করার ব্যবস্থাসহ সরে-জমিনে উপস্থিত হয়ে স্থানীয় জনগণের উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে যথার্থ ভূমিহীন কি-না তা যাচাই করবে।

(ত) মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হলে সেই বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।[৫৮]

(থ) চলতি ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরের শেষ নাগাদ ৫ থেকে ৭ হাজার ভূমিহীন কৃষিহীন পরিবারের মধ্যে ৮ থেকে ১০ হাজার একর জমি দেয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে এবং ১৯৯০ সাল নাগাদ সকল খাস জমি ভূমিহীন কৃষক পরিবারগুলোর মধ্যে বিতরণ শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

(দ) প্রতিটি ভূমিহীন কৃষক পরিবারকে ৩ হাজার টাকা মঞ্জুরী

---

৫৮. ভূমি মন্ত্রণালয় নির্দেশনামা, স্মারক নং—৮৪৬/৮৪/৭৭, তারিখ ৮/২/৮৭, উদ্ধৃত, "খাসজমির আন্দোলন ; তাৎপর্য্যপূর্ণ নতুন পর্যায়", মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাপ্তাহিক "একতা", ১লা মে, ১৯৮৭।

দেয়া হবে। গরু, হাল, সার, বীজ, কীটনাশক কেনার জন্য পরিবার প্রতি ঋণ কিম্বা অনুদানের মাধ্যমে ৫ থেকে ৮ হাজার টাকা দেয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে।

(ধ) খাস জমি বণ্টনের ব্যাপারে উপজেলা পর্যায়ে এনজিও প্রতিনিধিসহ "খাস জমি বণ্টন কমিটি" গঠন করা হয়েছে।

(ন) প্রকৃত ভূমিহীনদের খাস জমি দেয়ার ব্যাপারে ভূমি মন্ত্রণালয়ে এনজিও প্রতিনিধি সহ "ভূমি মন্ত্রণালয় সেল" নামে একটি সেল খোলা হয়েছে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ভূমিহীন-ক্ষেতমজুরদের প্রতি কোনো বাড়তি ভালবাসা থেকে এরশাদ সরকার হঠাৎ করে খাস জমি প্রশ্নে "প্রগতিশীল" (!) হয়ে পড়েনি। সস্তা জনপ্রিয়তা ছাড়াও এই ঘোষণার অন্যতম কারণ ছিল গ্রামের বর্তমান অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি কিছুটা হলেও ঠেকা দেয়ার জন্যে বিশ্বব্যাঙ্ক তথা সাম্রাজ্যবাদের চাপ। আর গ্রামে কিছু হারানোর ঝুঁকি (stake) কম বলে এই নগরকেন্দ্রিক 'সামরিক-আমলা-মুৎসুদ্দী সরকারটির পক্ষে এ রকম ঘোষণা দেয়াও সম্ভব হয়েছে।

আরেক উদ্দেশ্য হ'চ্ছে, এর দ্বারা গ্রামের কিছু লুম্পেন ভূমিহীন-দের গ্রামে ভিত্তিহীন বর্তমান সরকার ও সরকারী দলের প্রতি আকৃষ্ট করা।

এছাড়া এ রকম একটি ঘোষণা দিয়ে তার বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত করে নাকের ডগায় তা' ঝুলিয়ে রেখে ক্ষেতমজুরদের আকৃষ্ট রাখাও একটা উদ্দেশ্য হতে পারে। অনেকটা উত্তরবঙ্গবাসীর জন্য যমুনা ব্রীজের নাকের-ডগার-মূলোর মত।

জমি কম। ভূমিহীন বেশী। তাই ভূমিহীনদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও অনৈক্য সৃষ্টি ও তার থেকে ফায়দা লোটাও উদ্দেশ্য হতে পারে। সে কারণেই দেখি সরকার ভূমিহীনদের যৌথভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে জমি দিতে আগ্রহী।

এছাড়া স্বাধীনতার পর খাস জমি বিতরণকালে, তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কিছু লোকজন নানাভাবে অনেক জমি

দখলে এনে ভোগদখল করছিল। এই ঘোষণার দ্বারা তাদেরকে জমিচ্যুত করা যাবে এবং পাশাপাশি সরকারের বিরোধী গণতান্ত্রিক শিবিরে, অন্ততঃ গ্রামাঞ্চলে, অনৈক্য সৃষ্টি করা যাবে।

এখন দেখা যাক্ এরশাদ সরকারের এই বহুলবিজ্ঞপিত ঘোষণা ও কর্মসূচীর দুর্বল দিকগুলি কি কি।

বিস্‌মিল্লাতেই গলদ! বলা হ'চ্ছে খাস জমি রয়েছে ৮ লক্ষ একর, কিন্তু বাস্তবে খাস জমির পরিমাণ এর প্রায় দেড় গুণ—১২ লক্ষের মতন।

এক টাকা সেলামী দিয়ে জমি দেয়ার কথা, কিন্তু দুই টাকা কোর্ট ফী দিয়ে তো শুধু দরখাস্তই দিতে হয়েছে। পরের ঘুষের কথা তো বাদই দিলাম।

তবে এরশাদ সরকারের খাস জমি বিতরণের ক্ষেত্রে সবচে' ম্যাকারজনক দিকটা হ'চ্ছে এ কাজে সাম্রাজ্যবাদী অর্থপুষ্ট বিদেশী এনজিও-দের জড়িত করা।

ভূমি-মন্ত্রণালয় জুলাই মাসের শুরুতে খাস জমি বন্টনের নীতি-মালা সংক্রান্ত "ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বন্টনের নীতিমালা" শীর্ষক ৫৮ পৃষ্ঠার একটা পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। ১৬২ ধারা সংবলিত এই নতুন নীতিমালার একটি বড় অংশ জুড়ে খাসজমি বন্টনের প্রক্রিয়ায় বেসরকারী সাহায্য সংস্থা বা এনজিও-দের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এটা বোঝাই যায় যে সম্প্রতি খাসজমি দখলে আনার জন্য ক্ষেতমজুর সমিতি পরিচালিত সংগ্রামের জঙ্গীপনা ক্ষেত-মজুরদের মধ্যে সমাজতন্ত্র-অভিমুখীন যে বিপ্লবী চেতনার উন্মেষ ঘটাচ্ছিল তাতে আশঙ্কিত হয়েই সরকার সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশে সাম্রাজ্যবাদী অর্থসাহায্যে লালিত ও সাম্রাজবাদ নিয়ন্ত্রিত এনজিও সংস্থাসমূহকে খাসজমি বিতরণের কাজে টেনে এনেছে। আজকের বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এটা এক বাস্তবতা যে ক্ষেতমজুর সমিতিকে বাদ দিয়ে খাসজমি বিতরণ সম্ভব নয়। সরকারের নিজের দল জাতীয় পার্টি দিয়ে জমি বিতরণ যে সম্ভব নয়, সরকার নিজেও তা জানে। আর তাইতেই বোধ হয় মন্থরাকে ডাক-র মতই, এনজিও-দেরকে এ

ব্যাপারে ডাকা হয়েছে। তাছাড়া এই আশঙ্কা দীর্ঘদিন ধরেই এদেশের প্রগতিশীলরা করে এসেছেন যে গ্রামাঞ্চলে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে এনজিও-দের সাম্রাজ্যবাদ পুষছে মূলতঃ গ্রামের গরীবদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রগতিশীল ধারার সংগঠনের পাল্টা হিসেবে এবং কোনো বিশেষ মুহূর্তে তাদেরকে সে কাজে ব্যবহার করার লক্ষ্যে। সম্প্রতি খাসজমি বিতরণে এনজিও-দের সম্পৃক্ত করার সরকারের এই উদ্যোগ সেই সন্দেহের যথার্থতাই প্রমাণ করল। খাসজমি দখলের আন্দোলনে লক্ষ লক্ষ ক্ষেতমজুর যেভাবে ক্ষেতমজুর সমিতি, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল তাতে সাম্রাজ্যবাদ আশঙ্কিত হয়েই এই সরকারের মাধ্যমে এরকম একটা বিজাতীয় পরিকল্পনা উপস্থিত করেছে।

অবশ্য খাসজমি বিতরণের মত দেশের আভ্যন্তরীণ একটা ব্যাপারে বিদেশী এনজিও-দের সম্পৃক্ত করার সরকারের এই ঘোষণা বিনা চ্যালেঞ্জে পার পায়নি। ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক বিরোধী দল, নেতৃত্ব ও সংসদ সদস্য এ ব্যাপারে বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। খাসজমি বিতরণ সংক্রান্ত ক্ষেতমজুর সমিতির ১১-দফা দাবীনামার প্রথম দাবীটিই হচ্ছে সাম্রাজ্য-বাদ নিয়ন্ত্রিত বিদেশী সংস্থাগুলির মাধ্যমে খাসজমি বিতরণের বন্দোবস্ত বাতিল করতে হবে। এছাড়া দেশের ১৮টি ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনও এনজিও-সমূহকে খাসজমি বিতরণের কাজে জড়িত করা এবং তাদের তৎপরতার সুযোগ আরও বাড়ানোর জন্য সরকার ও রাষ্ট্রপতির ঘোষণা দেশের সার্বভৌমত্ব হানিকর, জাতীয় আত্মমর্যাদার পরিপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল ও গণবিরোধী আখ্যায়িত করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছেন।[৫১] বিবৃতিতে তারা বলেন, "সমাজবিপ্লবের পথ থেকে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরসহ মেহনতী জনগণকে বিপথগামী করাই এনজিও-দের প্রকৃত উদ্দেশ্য। ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সরকারী ছত্রছায়ায় এনজিও-দের কার্যকলাপ প্রতিহত করার জন্য দেশবাসী, বিশেষতঃ কৃষক, ক্ষেতমজুর ও মেহনতী জনগণের প্রতি

৫১. দৈনিক "সংবাদ", ১৩ই জুলাই, ১৯৮৭।

আহ্বান জানান।"[৬০]

আর খাস জমি বিতরণে এনজিও-দের সম্পৃক্ত করার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ জানিয়ে ক্ষেতমজুর সমিতির নেতৃবৃন্দ বলেন যে, একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে যে কেউ যে কোন সমিতির সদস্য হতে পারে। কিন্তু নতুন নিয়মে ভূমিহীনকে বাধ্যতামূলকভাবে এনজিও-র সমবায় সমিতিতে সদস্য হবার জন্যে যা বলা হয়েছে তা দেশের সংবিধানবিরোধী।[৬১] তাঁরা বলেন, "মাঠ পর্যায়ে এনজিও-র হাতে জমি থাকবে। উপজেলা পর্যায়ে নির্বাহী অফিসারের সইয়ের সাথে ভূমিহীনদের কার্ডে এনজিও প্রতিনিধিরও সই থাকতে হবে। ব্যাংক-ঋণ পাবার ক্ষেত্রেও এনজিও-র সুপারিশ থাকতে হবে। এটা কেমন কথা? বিদেশী সংস্থার হাতে আমাদের জমি ও মানুষ আটকা পড়ছে, এটা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না।"[৬২]

আমাদের দেশের খাসজমিকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে বিদেশী সাহায্য-সংস্থাগুলো ওদের নিজস্ব ধারায় এদেশের দরিদ্র ভূমিহীন-ক্ষেতমজুরকে সংগঠিত করুক, এটা কোন দেশপ্রেমিক নাগরিকই চাইতে পারেন না। আর খাসজমি বিতরণে দেশের স্থানীয় প্রশাসনকে যেভাবে এনজিও-দের সমকর্তৃত্বসম্পন্ন, এমনকি কখনো বা এনজিও-দের চেয়েও খাটো করা হয়েছে, তাও দেশের সার্বভৌমত্ব বিরোধী।

তাছাড়া ১লা জুলাই ১৯৮৭, ভূমি-মন্ত্রণালয় যে সর্বশেষ নির্দেশ (নির্দেশ নম্বর—ভূমি কোষ/১-১/১৭, পরিপত্র নম্বর ০১/১৩৯৪ বাংলা) জারী করেছে, তার ফলে সরকারের খাসজমি সংক্রান্ত পূর্ব সব ঘোষণা স্থগিত হয়ে পড়েছে এবং এই নির্দেশটি পুরোপুরিই, ক্ষেত-মজুরদের স্বার্থ-বিরোধী। এই নির্দেশাবলীতে যেসব নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে তার ফলে গত এক বছরের বেশী সময় ধরে যে লক্ষ লক্ষ ক্ষেতমজুর-ভূমিহীন স্ট্যাম্প খরচ বহন করে, বহু কষ্ট ও তেল-খড়

---

৬০. ঐ।

৬১. দৈনিক "সংবাদ", ১৮ জুলাই, ১৯৮৭।

৬২. ঐ।

পুড়িয়ে খাসজমির জন্য আবেদনের দরখাস্ত জমা দিয়েছিলেন, কলমের এক খোঁচায় তা' বাতিল হয়ে যাবে। অথচ সরকার এসব দরখাস্তের ব্যাপারে ফী নিয়েছে। নৈতিক ও আর্থিকভাবে সরকার দরখাস্তকারী ভূমিহীনদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে প্রতিশ্রুতি সরকার নিজেই এখন সাম্রাজ্যবাদের চাপে নির্লজ্জভাবে ভাঙ্গছে।

আর সাধারণভাবে, সরকারের খাসজমি বিতরণের কর্মপদ্ধতির মধ্যে বরাবরই ছিল এক অস্বাভাবিক দীর্ঘসূত্রিতা যা সরকারের আন্তরিকতার অভাবের প্রমাণ। টিভি ক্যামেরার লেন্সের সামনে বেচারা ভূমিহীনকে জমি দেয়ার ঘটনা খুব ঘটা করে দেখানো হ'লেও বাস্তবে গত ৫ই মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত মাত্র ১ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে মাত্র ২ হাজার একর জমি বিতরণ করা হয়েছে। অথচ জমি ও মানুষ উভয়ের তালিকাই সরকারের হাতে প্রস্তুত এবং এ ব্যাপারে দেরী ঘটার কোনো কারণই ছিল না। তাছাড়া ২৬শে এপ্রিল সরকারের সচিব বলেছেন যে ৮ লক্ষ একরের মধ্যে এ বছর মাত্র ১০ হাজার একর বণ্টন করা হবে, অর্থাৎ মোট খাসজমির মাত্র ১% বা ১.৫%! সরকার ১৯৯০ সালের মধ্যে সকল খাসজমি বণ্টন শেষ করার কথা বলে থাকলেও এ রকম ঢিলেতেতামি চলতে থাকলে এ কাজে গোটা শতাব্দীটাই লেগে যাবে!! এই সময়ের মধ্যে এই বিষয় নিয়ে জেগে উঠবে ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ঘাপলাবাজির নানা রকম ভেল্কিবাজী।

তাছাড়া প্রতি ভূমিহীন পরিবার পিছু ৩ হাজার টাকা দেয়ার যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তা' প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম।

উপজেলা পর্যায়ে যে "খাস জমি বণ্টন কমিটি" গঠন করা হয়েছে, ক্ষেতমজুরের প্রতিনিধিত্ব ছাড়া এ ধরনের বণ্টন কমিটি অনিবার্যভাবেই স্থানীয় সুবিধাবাদী, সাম্রাজ্যবাদের দেশীয় অনুচর এনজিও ও টাউটদের আখড়া হয়ে উঠবে। এটা কৌতূহলোদ্দীপক যে খাস জমি ভূমিহীনদের দেয়ার সরকারের এই ঘোষণা সাধারণভাবে সরকারের নিজস্ব শ্রেণী-চরিত্রের সঙ্গে বেশ অসঙ্গতিপূর্ণ। বিশ্ব-ব্যাঙ্ক ও দাতা দেশগুলোর চাপেই মূলতঃ বর্তমান সরকার এ রকম

একটা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। অসঙ্গতিপূর্ণ, কারণ, এর ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে গ্রামীণ সেই টাউট ও কায়েমী স্বার্থবাদীরাই মূলতঃ সরকারের গ্রামাঞ্চলে শক্তির মূল ভিত্তি! ইতিমধ্যেই খাস জমি বিতরণের কাজে এরা নানা রকম বাঁধা দেওয়াও শুরু করেছে।

বিত্তবান ও চাষবাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন টাউটেরা নানা রকম ভূঁয়া কবুলিয়ত পাট্টা দেখাচ্ছে। বলছে সেই জমিদারী আমলেই তাকে এই জমি দান করা হয়েছে কিম্বা এমন কারো কাছ থেকে এই জমি সে কিনেছে যাকে দান করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে নানা ভূঁয়ো দলিল সব হাজির করা হ'চ্ছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় তহশীল অফিসের দুর্নীতিবাজ কর্মচারী, প্রশাসন, সরকারী উকিল ইত্যাদির একটা চক্র (racket) গড়ে উঠেছে।

খাস জমির কিছু অংশ গোচারণ, গো-পাট, ঈদগাহ, মাদ্রাসা-মক্তব, খেলার মাঠ ইত্যাদি সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হ'চ্ছে। এসব খাস জমি ভূমিহীনদেরই প্রাপ্য। সামাজিক কাজে জমি দিতে ভূমিহীনদের আপত্তি নেই। কিন্তু তা' বিত্তবানদের কাছ থেকে নেয়াই কি আরো অধিকতর ইনসাফ নয়! খুব সহজ প্রশ্নই তুলেছেন ক্ষেতমজুর সমিতির সাধারণ সম্পাদক।[৬০]

সরকারের কর্মসূচী অনুযায়ী ১৯৮৬-৮৭ সাল অর্থ বছরের শেষ নাগাদ মাত্র ৫ থেকে ৭ হাজার ভূমিহীন কৃষক পরিবারের মধ্যে ৮ থেকে ১০ হাজার একর জমি দেয়া হবে (দেশে যেখানে ভূমিহীনের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় এক কোটি পরিবার!)! অবশ্য একথা সবাই বোঝেন যে দেশের সকল ভূমিহীনকে খাস জমি পাইয়ে দেয়া সম্ভব নয়। দেশের সকল খাস জমি দিয়ে (সিলিং উদ্বৃত্ত জমি সহ) মাত্র ৭-৮% ভূমিহীনদের জমি দেয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে ক্ষেতমজুর সমিতির প্রস্তাব হো'ল (যেহেতু সকলকে জমি দেয়া সম্ভব নয়), কোনো গ্রামে ৪/৫ জনের নামে ৮/১০ একর জমি বরাদ্দ করা হলেও সেই জমি গ্রামের ৩০/৪০ জন তথা সব ক্ষেতমজুর-ভূমিহীন, সম-

---

৬০. ক্ষেতমজুর সমিতির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের লেখা "খাস জমির আন্দোলন : তাৎপর্য্যপূর্ণ নতুন পর্যায়", সাপ্তাহিক "একতা" ১লা মে, ১৯৮৭।

বায়ের মাধ্যমে, যৌথভাবে, ভোগদখল করবে—এ রকম একটা ব্যবস্থা দাঁড় করানো যায়।[৬৪] তাছাড়া জমি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও সমিতির অধীনেই থাকা উচিত। কারণ এর অর্থনৈতিক দিকের চেয়ে রাজনৈতিক দিকটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক জায়গায় শুধুমাত্র বিত্তশালীরাই নয়, মাঝারি, এমনকি ছোট কৃষকরাও, খাস জমির মালিকানায় রয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে খাস জমি দখলের জোশে এই সব মেহনতী ও গরীব কৃষকদের সাথে যাতে সম্পর্ক নষ্ট না হয় সে ক্ষেত্রে ক্ষেতমজুর সমিতির সাধারণ সম্পাদকের বিবেচনা হ'চ্ছে, "...যেমন কোনো গ্রামে একজন গরীব মেহনতী কৃষকের নিজস্ব ২ একর জমি থাকা সত্ত্বেও সে পার্শ্ববর্তী ১ বিঘা খাস জমি ভোগদখল করছে। এমতাবস্থায় তাকে খাস জমি রাখতে দেয়া যেতে পারে। স্থানীয়ভাবে আপোসমূলক মীমাংসার মাধ্যমে এসব জটিলতা দূর করতে হবে।"[৬৫]

এটা এক বাস্তব সত্য যে খাস জমি সম্পর্কে শুধুমাত্র আইন করা (১৯৭৩ সাল থেকে দেশে এ-ব্যাপারে আইন রয়েছে!), জনবিচ্ছিন্ন এনজিও-দের তৎপরতা, কিম্বা রেডিও-টেলিভিশনে সরকারের কুম্ভীরাশ্রুই যথেষ্ট নয়। বিষয়টি জটিল ও কঠিন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সকল প্রকার আইনগত সুবিধা ও সমাজে অধিকতর গণতন্ত্রায়ন থাকলেও স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরেও ভারত তার ২১৫ লক্ষ একর উদ্বৃত্ত জমির মাত্র ১৮·৬% বন্টন করতে পেরেছে।[৬৬] আমাদের দেশেও ১৯৭২ সাল থেকে গত ১৫ বছরে সরকার মাত্র ২ লক্ষ একরের বেশী খাস জমি ভূমিহীনদের দিতে পারে নাই।

এর জন্য যা প্রয়োজন তা' হ'চ্ছে সচেতন জঙ্গী সাংগঠনিক উদ্যোগ। এ ব্যাপারে ক্ষেতমজুর সমিতির রেকর্ড উল্লেখযোগ্য। গত পাঁচ বছরে ক্ষেতমজুর সমিতি ১১৮টি খাস জমির আন্দোলন করেছে যার মধ্যে শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই বিজয় অর্জন সম্ভব হয়েছে। এসব আন্দোলনগুলিতে প্রায় ৭-৮ লক্ষ ক্ষেতমজুর সংগঠিতভাবে

---

৬৪. ঐ। ৬৫. ঐ।

৬৬. ভারতীয় খেতমজুর ইউনিয়ন, ৬ষ্ঠ সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট, পৃ—১১।

অংশ নিয়েছে এবং ১৯৮৬-এর জুন পর্যন্ত প্রায় ২৫ হাজার একরের বেশী জমি ও অসংখ্য খাস পুকুর ও বাওড় ভূমিহীনদের দখলে এসেছে। খালিয়াজুরীতে ১৩০০ বিঘা, কাপাসিয়ায় ৯০০ বিঘা, যশোরের শার্সায় ২০০ বিঘা, জীবননগরে ২৬৫ বিঘাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিদিনই ক্ষেতমজুরেরা দল বেঁধে লাল পতাকা গেড়ে খাস জমির দখল নিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে আন্দোলন খুবই জঙ্গী হচ্ছে। বস্তুতঃ যেখানে খাস জমির পরিমাণ বেশী, শ্রেণী-দ্বন্দ্ব তীব্র, যেমন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সুনামগঞ্জসহ অন্যান্য হাওড় এলাকা, রংপুর-দিনাজপুর সহ উত্তর বঙ্গের বড় জোতদারী এলাকাসমূহ, নোয়াখালী সহ দক্ষিণের উপকূলীয় এলাকা ও কুড়িগ্রাম থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত বড় নদীভাঙ্গা চরাঞ্চলে, খাস জমির আন্দোলন জঙ্গী হতে বাধ্য। ইতিমধ্যে নানা খুন-খারাবীর ঘটনাও ঘটেছে। আরো ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। আর মামলা-মোকদ্দমা তো নিত্য ব্যাপার। শুধুমাত্র জীবননগর উপজেলাতেই টাউট-বিত্তবানেরা খাস জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে ক্ষেতমজুরদের বিরুদ্ধে ১১টি মামলা দায়ের করেছে। কিন্তু এ সংগ্রাম ক্ষেতমজুরের শ্রেণী-সংগ্রাম। এই সংগ্রাম বর্তমানে তারে কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ক্ষেত্রে তার পিছু হঠার কোনো অবকাশ নেই। তাই ক্ষেতমজুর সমিতির বক্তব্য সরকার খাস জমির তালিকা ও বন্দোবস্তের কাগজ সরবরাহ করুক, জমি দখলের দায়িত্ব ক্ষেতমজুর সমিতির।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জমির তীব্র ক্ষুধাসম্পন্ন ক্ষেতমজুরদের মধ্যে খাস জমি পাওয়ার আকাঙ্খা খুবই তীব্র। খাস জমি ভূমিহীন-দের দেয়া হবে ঘোষণার পর ২৩শে মে তারিখে ঢাকার গুলশান ও ক্যান্টনমেণ্ট থানার (যেসব এলাকা কিনা শাসকশ্রেণীর মূল ঘাঁটি !) ভূমিহীনেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেরাই দলে দলে কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে এসে উপস্থিত হয় যাতে তারা জমি পেতে পারে !! বস্তুতঃ এদেশে সাংগঠনিকভাবে ক্ষেতমজুর আন্দোলন গড়ে ওঠার আগেও স্থানীয় পর্যায়ে খাস জমি দখলের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হয়েছিল। আন্দোলন হয়েছে পটুয়াখালীর দশমিনাতে, পীরগঞ্জের

মল্লিকপুরে, খালিয়াজুড়ীতে (যেখানে ক্ষেতমজুর জয়নাল শহীদ হন), চকোরিয়ায়, উজানগাঁওয়ে। মল্লিকপুরে সফল খাস জমি আন্দোলনের ফলে ক্ষেতমজুর সমিতি এত জনপ্রিয় হয় যে দু'জন ক্ষেতমজুর নেতা গরীবের ভোটে চেয়ারম্যান পর্যন্ত নির্বাচিত হন!

পরিশেষে বলতে চাই যে সর্বশেষ ঘোষণাটা দিয়ে সরকার পূর্বে-জমা-দেওয়া সব দরখাস্ত বাতিল করার আগে পর্যন্ত ক্ষেতমজুর সমিতির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ২ লক্ষ এবং ক্ষেতমজুর সমিতির প্রভাবাধীন আরো ২-৩ লক্ষ দরখাস্ত জমা পড়ে। খাস জমি দখল নেয়ার ব্যাপারে গ্রামের গরীবদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। দেখা গেছে, মাত্র ৫ একর জমির জন্য দুই হাজার পরিবার আন্দোলনে শরীক হ'চ্ছে! কোনো জমি বা পুকুর দখল আন্দোলনের ক্ষেত্রে, চারপাশের অন্যান্য গ্রামগুলো থেকেও, হাজার হাজার গরীব মানুষ ছুটে এসেছে (জমি পাবে না জেনেও!)। বস্তুতঃ এই খাস জমি দখল কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্রতি গ্রামের গরীবদের পুঞ্জীভূত শ্রেণী-ঘৃণার একটা বহিঃপ্রকাশে, একটা সামাজিক সংগ্রামে, পরিণত হয়েছিল। অতীতের সেই তেভাগা আন্দোলনের মতই, এলাকার একটা খাস জমি উদ্ধারের আন্দোলনে, গোটা একটা অঞ্চল আন্দোলিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা খুবই ইতিবাচক দিক।

তবে, খাসজমির সমস্যার প্রকৃত সমাধান মূলতঃ একটা রাজনৈতিক প্রশ্ন এবং রাজনৈতিকভাবেই সে সমস্যার সমাধান করতে হবে। তাছাড়া শুধুমাত্র খাস জমি পাওয়ার আশাতেই ভূমিহীনরা ক্ষেতমজুর সংগঠক করুক, এটাও কাম্য নয়। কারণ শুধুমাত্র খাস জমির একরৈখিক আন্দোলন দিয়েই ক্ষেতমজুর শ্রেণীর প্রকৃত সমস্যার সমাধান হবে না। তার সমস্যার চাই পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমাধান।

অন্যান্য দাবীসমূহ

খাস জমি ছাড়াও দেশে অসংখ্য খাস পুকুর, দীঘি, বিল, বাওড় ও জলাশয় রয়েছে। ইতিমধ্যেই অবশ্য ক্ষেতমজুররা বহু খাস পুকুর

ও দীঘি দখল নিয়ে সমবায়ের মাধ্যমে মাছ চাষ করছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সরকারের নীতির মধ্যে দেখা যাচ্ছে এক সুস্পষ্ট দ্বৈততা। সরকার খাস জমি ভূমিহীনদের দেয়ার কথা বলছে, কিন্তু খাস পুকুর আবার দিচ্ছে বিত্তবানদের। যেমন সরকার খাস পুকুর উপজেলা পরিষদের আওতায় নীলামে ডাকার যে ব্যবস্থা করেছে, বলার অপেক্ষা রাখে না যে তাতে ধনিকরাই এসব খাস পুকুর পাচ্ছে। কারণ ধনীরা নিলামে যে চড়া দর হাঁকছে, দরিদ্র ভূমিহীনরা তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠতে পারছে না[৬৭] এবং ধনীরাই খাস পুকুর ও খাস দীঘির দখল নিয়ে ফেলছে।

গত বছর ১৯শে আগষ্ট সুনামগঞ্জে মৎস্যজীবীদের এক সমাবেশে জেনারেল এরশাদ জলমহালের নতুন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তার সরকারের এক নতুন নির্দেশ প্রদান করেন। চলতি বছরের প্রথম দিকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মৎস্যজীবী সমিতির মহাসম্মেলনে রাষ্ট্রপতি এরশাদ তার পূর্ব ঘোষিত জলমহাল নীতি বাস্তবায়নে তার সংকল্পের পুনরুল্লেখ করেন। সংক্ষেপে এই নীতির কথা হচ্ছে "জাল যার জলা তার" এই নীতিমালা অনুসারে দেশের সকল জলমহাল থেকে মধ্য-সত্ত্বভোগী ইজারাদারী প্রথা ক্রমান্বয়ে বিলোপ এবং সে স্থলে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের কাছে দায়িত্বভার অর্পণ।[৬৮] এ প্রসঙ্গে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের হিসাব হ'চ্ছে যে দেশের সকল জলমহাল থেকে ইজারা প্রথা ক্রমান্বয়ে বিলোপ সাধন এবং প্রকৃত মৎস্যজীবীদের কাছে মাছের চাষ, মাছ ধরা ও মাছ বাজারজাতকরণের সরাসরি ও পূর্ণ অধিকার অর্জনের জন্যে কমপক্ষে ১০ বছর সময় প্রয়োজন। কিন্তু সরকারী হিসাব অনুযায়ীই প্রথম বছরে এই নীতি বাস্তবায়নে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি এবং গত এক বছরে মাত্র ১০টি জলমহাল এই নতুন ব্যবস্থাপনা নীতির আওতায় এসেছে![৬৯]

---

৬৭. মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম "খাসজমির আন্দোলন : তাৎপর্যপূর্ণ নতুন পর্যায়", সাপ্তাহিক "একতা" ১লা মে, ১৯৮৭।

৬৮. দৈনিক "সংবাদ", ২০শে মে, ১৯৮৭।

৬৯. ঐ।

মন্ত্রণালয় স্থির করেছিল যে এসব জলমহালগুলোতে প্রকৃত মৎস্য-জীবীদের অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং মৎস্যজীবী ইজারাদার ব্যবসায়ী-দের প্রাধান্য খর্ব করার জন্য এই সব জলমহালের নতুন নিলাম ডাক স্থগিত রাখা হবে এবং দেশের সর্বত্র উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যান, উপজেলার রাজস্ব কর্মকর্তা, সমবায় কর্মকর্তা, স্থানীয় কৃষি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও জাতীয় মৎস্যজীবী স্থানীয় ২ জন প্রতিনিধিকে সদস্য এবং উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে মৎস্য সচিব করে এই সমন্বয় কমিটি গঠিত হওয়ার কথা। জেলা পর্যায়েও অনুরূপ সমন্বয় কমিটি গঠনের নির্দেশ ছিল। কিন্তু বাস্তবে খুব কম সংখ্যক উপজেলাতেই এ পর্যন্ত সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়েছে। জেলাগুলোতেও একই অবস্থা।[৭০]

এছাড়া সরকার ঘোষণা করেছে যে নতুন নীতিমালা অনুযায়ী ৩ একর আয়তনের সীমা ও ৫ হাজার টাকা ইজারা মূল্যের কোন জলমহাল আর ইজারা দেয়া হবে না এবং সে সকল জলমহালের পার্শ্ববর্তী জনসাধারণ সেখানে বিনা রাজস্বে মাছ ধরতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে এই আদেশ প্রদানের পর থেকে বিভিন্ন জেলার ৩ একরের ছোট জলমহালগুলোতে ৩ একরের উর্দ্ধে আয়তন-বিশিষ্ট দেখিয়ে সেখান থেকে "খাস কালেকশন"-এর নামে চড়া হারে রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা চলছে।[৭১]

বস্তুতঃ বিলে খেওয়া জাল ব্যবহারের অধিকার গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের দীর্ঘদিনের দাবী। বাংলাদেশে যে ৮,৫১৩টি স্বীকৃত জল-মহাল রয়েছে যা প্রায় ৪,৪৬,৫১০ একর জমি জুড়ে অবস্থিত। সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ সহ গোটা ভাটি এলাকার সব বড় বড় জলমহাল ও হাওড়গুলি জনগণের অর্থনৈতিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং তা' শ্রেণী-দ্বন্দ্বেরও এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এসব হাওড়ের কোটি কোটি টাকার মৎস্য-সম্পদ গ্রাস করার লক্ষ্যে শক্তিশালী ও ধনাঢ্য ইজারাদাররা অত্যন্ত তৎপর

---

৭০. "সংবাদ", ২০শে মে, ১৯৮৭।

৭১. ঐ।

এবং ক্ষুদে মৎস্যচাষী ও ক্ষেতমজুরদের (এসব এলাকার বছরে প্রায় ছয়মাস ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছোটখাট মাছ ধরার উপরই ক্ষেতমজুর পরিবারদের জীবিকা নির্ভরশীল) উৎখাতের লক্ষ্যে তারা ঘুষ দুর্নীতি-সহ নানারকম ব্যবস্থা নিয়ে চলেছে। অপরদিকে ক্ষেতমজুরের প্রাণের দাবী ভাসান পানিতে মাছ ধরার তার ঐতিহ্যগত অধিকার সংরক্ষণে গরীব মৎস্যচাষী ও ক্ষেতমজুররা সাম্প্রতিককালে ভাটি এলাকায় এমন ব্যাপক আন্দোলনই গড়ে তুলেছিলেন যে বর্তমান সরকারের মত গণবিরোধী এক সরকারও নীতিগতভাবে "জাল যার জলা তার" এই দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে, যদিও বাস্তবে তার কোনোই প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে না। বস্তুতঃ খালিয়াজুড়ী, তাহেরপুর, ধর্মপাশা সহ বিভিন্ন হাওড় অঞ্চলে ভাসান পানিতে মাছ ধরার অধিকার নিয়ে ক্ষেতমজুর, গরীব মৎস্যচাষী ও ক্ষুদে কৃষকেরা আন্দোলনে যে জঙ্গীপনা দেখিয়েছেন তাতে এই মাছ ধরার আন্দোলনকে যে একটা শক্তিশালী শ্রেণী-আন্দোলনে রূপান্তরিত করা সম্ভব, তা' প্রমাণিত হয়েছে।

দেশে স্বীকৃত ৭,৪০৩টি হাট-বাজার রয়েছে যার আয়তন ১০,০১৫ একর। এছাড়া লৌকিকভাবে স্বীকৃত অনেক হাট-বাজারও বিদ্যমান। ইজারাপ্রথার কারণে এসব হাট-বাজারে ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষীরা প্রতিদিনই শোষিত হ'চ্ছে। সামান্য ক'টা ডিম বা একটা মুরগী বেচতে আনলেও ইজারাদারকে একটা বড় অঙ্কের অর্থ দিতে হয়, যা সম্পূর্ণ বে-আইনী। আইন অনুযায়ী শুধুমাত্র স্থায়ী দোকানদারদের কাছ থেকেই তোলা আদায় করা যায়, কিন্তু ইজারাদাররা সবার কাছ থেকেই বেআইনীভাবে তোলা তুলে থাকে যার পরিমাণ কখনও কখনও সরকারী রেটের তিন-চারশত ভাগেরও বেশী! রাষ্ট্রযন্ত্র গ্রামাঞ্চলে ইজারাদার নামক এই পরজীবি পেশা ও শ্রেণীটাকে জীইয়ে রাখতে চায়। জিয়ার আমলে আমরা দেখেছি যে "যুব কমপ্লেক্স" নামে গ্রামের মাসলম্যানদের হাত করার জন্যে হাট-বাজারের ইজারাদারীকে এসব যুবকদের কাছে একটা প্রত্যক্ষ ঘুষ হিসাবে তুলে দেয়া হয়েছিল। ও পদ্ধতি এখন আর নেই, কিন্তু হাটে-বাজারে

ক্ষেতমজুর গরীব চাষীদের উপর শোষণ ও নির্যাতন তো কিছুমাত্র কমে নাই-ই, বরং ক্ষেত্র বিশেষে—বেড়েছে।

গ্রামে রেশন-ব্যবস্থা চালু করার দাবী ক্ষেতমজুরদের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবী। এই রেশন প্রসঙ্গে আমাদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার শ্রেণী-চরিত্রটি সবচে' প্রকটভাবে ফুটে ওঠে। রেশনের প্রয়োজন যাদের সবচে' বেশী সেই গ্রামের ভূখা-নাঙ্গা মানুষদের জন্যে সরকার রেশন দেয় না, রেশন দেয়া হয় ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহীর মত বড় বড় শহরে যেখানে দেশের ধনিক ও সোচ্চার মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি বাস করে যেসব শ্রেণীকে রাষ্ট্র তুষ্ট রাখতে চায়। বস্তুতঃ রাষ্ট্রের নীতি যে কতখানি নগর পক্ষপাতদুষ্ট (urban-biased) তা' গ্রাম ও শহরের চালের দামের পার্থক্য থেকেই বোঝা যাবে :

বৎসর	গ্রামাঞ্চলে মাঝারি চালের খুচরা দর (মণপ্রতি)	শহরাঞ্চলে রেশনের চালের খুচরা দর (মণপ্রতি)
১৯৬৫—৬৬	৩৫.৯৫	২৬.১৩
১৯৬৬—৬৭	৪৩.১০	২৮.২২
১৯৬৭—৬৮	৪২.৫০	৩০.১৭
১৯৬৮—৬৯	৪৬.২৩	৩০.৮০
১৯৬৯—৭০	৪৪.৭৮	৩০.৪০[১২]

তাছাড়া শ্রেণীবিভক্ত গ্রামেও খাদ্যগ্রহণের তারতম্য রয়েছে। ১৯৬৮ সালের এক জরীপে দেখা যাচ্ছে বড় জোতের মালিকের খাদ্য গ্রহণের সূচক যেখানে ১১৬, একজন ক্ষেতমজুরের সেখানে ৯০। বলার অপেক্ষা রাখে না বিগত বছরগুলিতে দারিদ্র্যের তীব্রতায় ক্ষেতমজুরের ক্ষেত্রে খাদ্য গ্রহণের এই সূচক আরো কমে এসেছে। অথচ কায়িক শ্রম করে বলে ক্ষেতমজুরেরই খাদ্য বেশী প্রয়োজনীয়

১২. আলমগীর ও কারলেজ, "বাংলাদেশের জন্য খাদ্যশস্য (চাল/গম) চাহিদা, আমদানী ও দানের নীতি", "দি বাংলাদেশ ইকনমিক রিভিউ", খণ্ড-১, সংখ্যা-১, জানুয়ারী ১৯৭৩। উদ্ধৃত, আয়েশা বানু. প্রাগুক্ত, পৃ—৪০।

এবং রেশন।

ক্ষেতমজুরের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নেই। নেই যৌথভাবে দর কষাকষির অধিকারের স্বীকৃতি। গ্রামীণ মজুরদের সম্পর্কে আই, এল, ও-র ১৪১ নং ধারাসমূহে সরকার আজো স্বাক্ষর করে নাই। শ্রমিক হিসাবে তাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নাই। শহরের চাকুরীজীবী ও কারখানার শ্রমিকরা ওভারটাইম পান। ক্ষেতমজুরের কাজের কোনো সময়সীমা নেই। ৮ ঘন্টা নয়, তাকে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করতে হয়। মে দিবসের অধিকার তার জীবনে প্রতিবছর ব্যর্থ নমস্কারেই ফিরে যায়। চাকুরীজীবী ও কারখানার শ্রমিকদের জন্যে রয়েছে মহার্ঘ্যভাতা ও পে-কমিশন। ক্ষেতমজুরের জন্যে পে-কমিশনের দাবী তো প্রায় এক দিবাস্বপ্ন!

এছাড়া ধনীদের কাছ থেকে রয়েছে প্রাপ্য হিসেবে তুই-তোকারি, সামান্য অপরাধে অপমান, জুতোপেটা ও নানাবিধ সামাজিক অত্যাচার। আর ক্ষেতমজুর পরিবারের অসহায় নারীরা তো সর্বদাই গ্রামের ধনীদের লালসার লক্ষ্য।

ক্ষেতমজুরদের এই সকল সমস্যার সমাধানের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে গ্রামের প্রগতিশীল পুনর্গঠনের প্রশ্ন, যার মূল বিষয় হচ্ছে—এক র‍্যাডিকাল ভূমি-সংস্কার। ভূমি-সংস্কারের এই প্রশ্নটি প্রতিটি জাতিই অবশ্য তার নিজস্ব সুনির্দিষ্ট সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই নির্ধারণ করবে। বস্তুতঃ একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মঙ্গোলিয়া ছাড়া, আর কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশও, এখনও দেশের সমস্ত জমি জাতীয়কৃত করেনি। এ পর্যন্ত হাঙ্গেরী ২.৫%, জিডিআর ১০.৮%, পোল্যাণ্ড ২০%, রুমানিয়া ২০.৬%, চেকোশ্লোভাকিয়া ২৩.৩%, যুগোশ্লাভিয়া ২৮.৭% ও কিউবা ৭০% জমি জাতীয়করণ করেছে।[৭৩] ভূমি-সংস্কারের ক্ষেত্রে সব সময়ই মূল প্রশ্নটা হ'চ্ছে সমাজটা বিপ্লবের কোন্ স্তরে রয়েছে। যেহেতু এদেশের মার্কসবাদীরা বাংলাদেশের সামাজিক বিপ্লবের স্তর জাতীয় গণতান্ত্রিক

---

৭৩. "সমবায় প্রসঙ্গে, লেনিনের রচনা", সেরগেই সেরাযেভ, পৃ—৮৬, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪।

পর্যায়ে বলেছেন, তাই বেগার খাটুনী, রায়তী প্রথা, মহাজনী শোষণ, ইজারাদারী, সামন্তবাদের এসব অবশেষসমূহ দুর করা এবং জমির সিলিং নির্ধারণ করাই এ পর্যায়ে ভূমি-সংস্কারের প্রশ্নে গুরুত্ব পাবে।

প্রাথমিকভাবে ক্ষেতমজুরদের দাবীসমূহ ও আন্দোলন ইনসাফ ও মানবতাবাদী দাবীর ভিত্তিতে গড়ে উঠলেও শীঘ্রই তার তীক্ষ্ণ শ্রেণী-গত রূপটা ফুটে উঠতে বাধ্য এবং ইতিমধ্যেই ক্ষেতমজুর আন্দোলনের জঙ্গীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। শুধুমাত্র গত বছরে ক্ষেতমজুররা দুই শতাধিক গম-আন্দোলন করে বিজয়ী হয়েছে, যার কিছু কিছু আন্দোলন খুবই জঙ্গী ছিল। এসব আন্দোলনে প্রায় ছয় লক্ষ ক্ষেতমজুর অংশ নেয়। এ ছাড়া বিভিন্ন ইস্যুতে প্রায় তিন শতাধিক স্থানীয় সংগ্রামে ক্ষেতমজুর সমিতি সফল হয়েছে।

ক্ষেতমজুর সমিতির বৃদ্ধিও লক্ষ্যণীয়। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে ক্ষেতমজুর সমিতি ৫,১১৬টি গ্রামে সংগঠন ও তিন লক্ষ ক্ষেতমজুরকে সংগঠিত করতে পেরেছে। বাংলাদেশের বিদ্যমান বুর্জোয়া পেটি-বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলোর গ্রামাঞ্চলে সাংগঠনিক দেউলিয়াত্বের পাশাপাশি এই বিকাশ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, এবং এ বিকাশ, প্রতি-দিনই বাড়ছে। বিগত সংসদ নির্বাচনে মূলতঃ সে সব জায়গা থেকেই কমিউনিস্ট প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন যেখানে ক্ষেতমজুর সমিতির সংগঠিত শক্তি রয়েছে। বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। এ ছাড়া স্থানীয় সরকারগুলোর নির্বাচনে সচেতন ক্ষেতমজুররা বহু স্থানেই সরাসরিভাবে নিজেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন কিম্বা প্রগতিশীল প্রার্থীদের জিতিয়ে দিয়েছেন।

তবে প্রতিক্রিয়াশীলরাও বসে নেই। ক্ষেতমজুরদের আন্দোলন প্রশ্নে গ্রামে রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটছে। ক্ষেতমজুরদের রক্ত ঝরেছে খালিয়াজুরী, জামালপুর, নোয়াখালীর চরে। পিরোজপুরের ফজর আলী শহীদ হয়েছেন। এরকম ঘটনা আরো ঘটবে। শ্রমিক আন্দোলনের শহীদ তাজুল ইসলামের মত ক্ষেতমজুর আন্দোলনেও বহু তাজুল শহীদ হবেন। তবে তা' ক্ষেতমজুর আন্দোলনকে দুর্বল

করতে পারবে না। প্রতিক্রিয়ার আঘাতে আঘাতে পোড় খেয়েই ক্ষেতমজুর সমিতি এক জঙ্গী ও বিপ্লবী সংগঠনে রূপ নেবে এবং ক্ষেতমজুর আন্দোলন তার মানবিক দাবী-দাওয়াকে ছাপিয়ে একটা যথার্থ শ্রেণী-আন্দোলনে রূপান্তরিত হবে।

ক্ষেতমজুর আন্দোলনের শত্রু-মিত্র প্রসঙ্গে

আমরা আগেই বলেছি যে আমাদের দেশের কৃষিতে বর্তমানে যে সঙ্কট চলছে তা' সরকারের নন-পলিসি বা পলিসির অনুপস্থিতি নয়, সুনির্দিষ্ট পলিসিসমূহেরই ফলশ্রুতি। বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও সাম্রাজ্যবাদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী আমাদের দেশের সরকার এই নীতি কার্যকরী করছে যার মূল লক্ষ্য হ'চ্ছে গ্রামের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ ত্বরানিত করা। ক্ষেতমজুর আন্দোলনের শত্রু-মিত্র নিরীখের বিচার এই সার্বিক পটভূমিটাকে মনে রেখেই করতে হবে।

একটা কথা ক্ষেতমজুর ভাইয়েরা কখনোই ভোলেন না তা' হ'চ্ছে তার সংগ্রাম শুধুই কৃষকের বিরুদ্ধে নয়, যেমন মাওবাদীরা, অতি-বামেরা ও এনজিওরা বলে থাকে। কৃষক তাকে কর্মে নিয়োগ করে থাকে। সেক্ষেত্রে কৃষকের সঙ্গে তার মজুরীর দ্বন্দ্বটি রয়েই যায়, তবে পাশাপাশি কৃষককে যারা শোষণ করে সেই দেশী-বিদেশী মুৎসুদ্দী লুটেরা ধনিক, সরকার ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও তার সংগ্রাম রয়েছে।

তবে গ্রামের জোতদার ও ধনী কৃষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সে আপোষহীন। ১৯৭৭ সালের ভূমি-দখলী স্বত্ব জরীপ অনুযায়ী গ্রামের উপরের দিকের মাত্র ১০% গ্রামের মোট আবাদী জমির ৫০%-এর মালিক; এই শ্রেণীর সঙ্গে ক্ষেতমজুর শ্রেণীর দ্বন্দ্ব বৈরী দ্বন্দ্ব। মার্কস "উৎপাদন বিকাশের বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরের সাথেই শ্রেণীসমূহের অস্তিত্ব জড়িত"[৭৪] বলে যে কথা বলেছেন,

৭৪. মার্কস-এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলী, খণ্ড-৪, পৃ—১৫।

ক্ষেতমজুর শ্রেণীর একটা পৃথক শ্রেণী হিসেবে গড়ে ওঠার গোটা সেই ঐতিহাসিক পর্বটা পর্যন্ত এই দ্বন্দ্ব চলতেই থাকবে।

নয়া-ট্রটস্কিবাদীরা যে রকম সকল দ্বন্দ্বকেই পুঁজিপতি-শ্রমিক বা মাওবাদীরা যেমন জোতদার-ভূমিহীন দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখে, ক্ষেতমজুরের শত্রু-মিত্র বিচারে সমস্যাটির অত সরলীকরণ করা ঠিক হবে না। আমাদের সমাজ এখনও লেনিন বর্ণিত সেই বহু কাঠামো-বিশিষ্টই (multi-structural)। এর মধ্যে ক্ষেতমজুররা হ'চ্ছে আদি-সর্বহারা (Proto-Proletariat)। একটা শ্রেণী হিসাব তার গড়ে ওঠার পর্যায়টাতে উপরস্থ সকল শ্রেণীর সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব রইবে।

তাছাড়া কৃষকেরা কোনো একক (homogeneous) শ্রেণী নয়। কৃষকসমাজও বহুস্তরবিশিষ্ট (stratified)। রয়েছে ধনী, মাঝারি ও গরীব কৃষক। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে এদের প্রতিটি স্তরের প্রতি ক্ষেতমজুরের দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন হবে।

গ্রামীণ ধনীরা নগরাঞ্চলের প্রভাবশালীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে চলে ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখা বা প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের উপর কিছুটা হলেও প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। আর মেট্রোপলিটন রাষ্ট্র-যন্ত্রও গ্রামাঞ্চলে তার সহায়ক শ্রেণী হিসেবে গ্রামের ধনিক শ্রেণীটিকে হাতে রাখতে চায়। আরেকটা লক্ষ্য হ'চ্ছে আমাদের মত স্বল্প পুঁজির এই দেশে গ্রামাঞ্চল থেকে নিংড়ে যৎসামান্য যা পাওয়া যায়, সেই সম্পদ নগরমুখী করা। পরের পৃষ্ঠার সারণীটি থেকে বোঝা যাবে গত কয়েক বছর কি-ভাবে গ্রাম ও শহরের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবর্তিত হয়েছে ;

স্পষ্টতঃই বোঝা যায় সম্পদ শহরে পাচার হ'চ্ছে। তবে আমরা মাওবাদীদের মত "গ্রামের-বিরুদ্ধে-শহর" এরকম কোনো দ্বন্দ্বকে মূল্য ধরা অবৈজ্ঞানিক মনে করি। গ্রাম ও শহরের মধ্যেকার দ্বন্দ্বটাকে মূল করে দেখার দৃষ্টিভঙ্গীর ভ্রান্তিটা এখানেই যে গ্রামে যেন কোনো শ্রেণী-দ্বন্দ্ব নেই! কিম্বা নেই শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ।।

গ্রাম ও শহরের মাথাপিছু আয়ের তারতম্য

(১৯৭২—৭৩ সালের টাকা হিসাবে)

বছর	গ্রাম	শহর
১৯৭৩—৭৪	৫৬৮	১৫৮৫
১৯৭৫—৭৬	৬১১	১৯৪৬
১৯৭৮—৭৯	৬২৭	২২৮২
১৯৭৯—৮০	৬৩০	২৪৩১([৭৫])

বস্তুতঃ গ্রামের ধনী কৃষক শ্রেণী, ইটের ভাঁটা, রাইস মিলের মালিক প্রমুখ গ্রামীণ মুৎসুদ্দী ও মহাজনদের পাশাপাশি শহুরে লুটেরা ধনিক শ্রেণী, আমলা-মুৎসুদ্দী পুঁজি ও তাদের মুরুব্বী সাম্রাজ্যবাদ ক্ষেতমজুর শ্রেণীর স্বার্থের শত্রু। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এই সার্বিক প্রেক্ষাপটকে মনে রেখেই ক্ষেতমজুর শ্রেণী তার শত্রুকে চিহ্নিত করবে, এবং—মিত্রকেও।

যেহেতু ক্ষেতমজুর আন্দোলন একটা বৃহত্তর সমাজ-পরিবর্তনের আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, তাই শ্রেণীগতভাবে ক্ষেতমজুরের সবচে' নিকটতম মিত্র হ'চ্ছে সমাজ-পরিবর্তনে সবচে' বিপ্লবী শ্রেণী —কারখানার শ্রমিক ভাইয়েরা।

গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কৃষকেরা, যাদের মধ্য থেকে ক্ষেতমজুর শ্রেণীর উদ্ভব ও যারাও প্রায় অনিবার্য্যভাবেই আগামীতে ক্ষেতমজুরে পরিণত হবে (বা বর্তমানে আংশিকভাবে হয়েছে), তারাও ক্ষেতমজুরদের নিকটতম মিত্র।

এবং রয়েছে মাঝারি কৃষকেরা। কর্মবিনিয়োগ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর সঙ্গে ক্ষেতমজুরের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। তবে যেহেতু এটা একটা ভিন্ন শ্রেণী এবং ক্ষেতমজুরদের সঙ্গে এই শ্রেণীর সম্পর্ক অনেকক্ষেত্রেই নিয়োগকর্তা-মজুরীশ্রমিক (Employer-employed) তাই এদের সম্পর্কে ক্ষেতমজুরদের দৃষ্টিভঙ্গীটা হওয়া চাই দ্বান্দ্বিক।

৭৫. "বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা", নজরুল ইসলাম, পৃ-৭১, সারণী—১২।

মজুরী প্রশ্নে ক্ষেতমজুর কোনো ছাড় দিতে আগ্রহী নয়, তবে পাশা-পাশি এটাও সে মনে রাখে যে তার সংগ্রাম গৃহস্থের বিরুদ্ধে নয়।

ফসল উৎপাদন, বীজ-উৎপাদন, নানারকম গবেষণামূলক কাজ, তুলা-আখ-রেশন চাষ, হাঁস-মুরগী-গবাদি পশু পালনের প্রায় শ' খানেক সরকারী ও বে-সরকারী কৃষি-ফার্ম দেশে রয়েছে। এসব কৃষি-ফার্মে কর্মরত কৃষি-মজুররাও শোষিত। কমে ৩০/৪০ জন, উর্ধ্বে ৩০০/৪০০ জন শ্রমিক এরকম একেকটা ফার্মে কাজ করে। এরা ক্ষেতমজুর শ্রেণীর অগ্রবর্তী অংশ এবং আগামী দিনের রাষ্ট্রীয় খামারের সম্ভাব্য শ্রমিক। ক্ষেতমজুর শ্রেণী এদের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রী গড়ে তুলতে আগ্রহী।

ক্ষেতমজুর আন্দোলনের যাতে সঙ্কীর্ণ বাম-বিচ্যুতি না ঘটে, সে যাতে দুই পায়ে হাঁটতে পারে, তাই ক্ষেতমজুরদের নিজেদের স্বার্থেই প্রয়োজন কৃষকদের সংগঠন। ক্ষেতমজুররা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে, ও স্বার্থেই, উপলব্ধি করে কৃষকদের সংগঠন থাকার প্রয়োজনীয়তা। তবে দুঃখজনক যে একমাত্র বাংলাদেশ কৃষক সমিতি ছাড়া আর কোনো সক্রিয় কৃষক-সংগঠনের অস্তিত্ব বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে তেমন নেই। বিগত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সময় গঠিত ১৬টি সংগঠনের "কৃষক-ক্ষেতমজুর সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ"-এর কাজের অভিজ্ঞতা দেখায় যে একমাত্র ক্ষেতমজুর সমিতি ও কৃষক সমিতি ছাড়া বাস্তবে আর কোনো কৃষক-ক্ষেতমজুর সংগঠনের অস্তিত্ব গ্রাম-পর্যায়ে নেই। অন্যান্য কৃষক-সংগঠনগুলো প্রায় সবাই কাগুজে সংগঠন। সাইনবোর্ড সর্বস্ব।

এমনকি প্রাক্তন মাওবাদী দলগুলি, যারা সর্বদাই 'কৃষকদের' (!) কথা বলে, তাদেরও গ্রাম-পর্যায়ে তেমন কোনো সংগঠন নেই। এমনকি, যে বদরুদ্দীন ওমর-প্রমুখ-বুদ্ধিজীবী-গণ্ড-য়েরা 'কৃষক', 'কৃষক' করে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে মাতম তোলেন, তাদেরও শুধুমাত্র পটুয়াখালীর দক্ষিণাঞ্চলে যৎসামান্য ছাড়া বাস্তবে কার্যকরী কোনো কৃষক-সংগঠন নেই !! রণো-মেননদের অবস্থাও তথৈবচ !

অবশ্য কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী-প্রশ্নে ক্ষেতমজুর শ্রেণী কখনোই

তার নিজস্ব শ্রেণী-স্বার্থ বিকিয়ে দেবে না, কিম্বা কৃষকদের শ্রেণী-প্রকৃতি, অর্থাৎ তার ক্ষুদে মালিকী মনোবৃত্তির কথাটা ভুলবে না, যে মনোবৃত্তি কৃষকদের বিপ্লবী হয়ে ওঠার পক্ষে এক বড় বাঁধা। ক্ষেত-মজুর শ্রেণীর শৃঙ্খল ছাড়া হারানোর কিছু নেই, জয়ের জন্যে আছে গোটা বিশ্ব। কিন্তু কৃষকের আর কিছু না থাকলেও আছে জমি। আছে পিছুটান। কৃষক শ্রেণীর এই সীমাবদ্ধতা মনে রেখেই ক্ষেতমজুর শ্রেণী তার সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হবে। যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই এই দুই শ্রেণীর স্বার্থে অভিন্নতা রয়েছে, তাই এই দুই শ্রেণীর ঐক্য সমাজ-পরিবর্তনে এক শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। এর কিছু কিছু প্রাক্-আলামত আমরা দেখতে পাচ্ছি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৯৮৭ সালের ১১ই মার্চ ঢাকায় শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে মিলে কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের বিরাট সমাবেশটির কথা। সমাবেশের মূল দাবী ছিল পাটের দাম, কৃষি ঋণ, খাস জমি, গম চুরি, হোল্ডিং কোম্পানি গঠন ও শেয়ার বিক্রী বন্ধ, কল-কারখানা চালু ইত্যাদি এবং এই সমাবেশে ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর এক ব্যাপক অংশ উপস্থিত ছিল। ক্ষেতমজুর, কৃষক, শ্রমিক—সমাজ-বিপ্লবের এই তিন শক্তির যৌথ কার্যক্রম দেখে প্রগতিশীলরা উৎসাহিত হয়েছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই ত্রি-শক্তির ঐক্য যত দৃঢ় হবে, বাংলাদেশে সমাজ-বিপ্লবের আন্দোলনও ততই শক্তিশালী ও ত্বরান্বিত হবে।

ক্ষেতমজুরদের রাজনীতিকরণ প্রসঙ্গে

ক্ষেতমজুর আন্দোলন "সুখী নীলগঞ্জ"[১৬] জাতীয় প্রকল্প নয়। প্রশিক্ষণ, নাইট স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি তার কর্মকাণ্ডের অংশ হলেও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনই তার মূল কাজ। কারণ আন্দোলনই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণ। ক্ষেতমজুররা এখনও,

---

১৬. বাংলাদেশ টেলিভিশনের "এইসব দিনরাত্রি" নামক ধারাবাহিক নাটকের জনৈক মধ্যবিত্ত চরিত্রের গ্রাম-উন্নয়নের রোমান্টিক কল্পনা বিলাস।

লেনিনের ভাষায়, একটি স্ব-স্থিত শ্রেণী (Class-in-itself)। যতদিন তারা একটি স্ব-হেতু শ্রেণী (Class-for-itself) না হ'চ্ছে, অর্থাৎ সচেতনভাবে নিজেদেরকে একটি পৃথক শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত করতে না পারছে, ততদিন চেতনা-বিকাশের কাজটিই মুখ্য থাকছে।

মূলতঃ অর্থনৈতিক আন্দোলনই এক সময় রাজনৈতিক চেতনায় রূপান্তরিত হলেও অন্যান্য অ-অর্থনৈতিক আন্দোলনেরও একটা শ্রেণীগত তাৎপর্য্য রয়েছে। যদি শ্রেণী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ইস্যুতে ক্ষেতমজুর শ্রেণী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে না পড়ে, তা'হলে ক্ষেতমজুর আন্দোলনও অর্থনীতিবীদের শিকার হতে পারে যা আমাদের দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কখনো কখনো হয়েছে বলে অনুযোগ রয়েছে। আর এই রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রশ্নেই আসে রাজনৈতিক দলের প্রশ্ন, ক্ষেতমজুরদের রাজনীতিকরণের প্রশ্ন—কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার প্রশ্ন।

ক্ষেতমজুর আন্দোলনে রাজনৈতিক দলের এই ভূমিকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে উত্তরটা এনজিও-রা জানে না বিধায় তাদের সব প্রচেষ্টাই মাঝপথে মুখ থুবড়ে পড়ে। আমরাও অভিজ্ঞতায় দেখি যে যেসব জায়গায় কমিউনিস্ট পার্টি শক্তিশালী সেখানে ক্ষেতমজুর আন্দোলনও শক্তিশালী, এবং যেখানে ক্ষেতমজুর আন্দোলন শক্তিশালী সেখানে বিষয়গত চাপেই কমিউনিস্ট পার্টি বিকাশমুখী। রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনের সম্পর্কের এই দ্বান্দ্বিকতা অনুধাবন করতে না পারলে ক্ষেতমজুর আন্দোলনের বাস্তবতার অনেক দিকই উপলব্ধির বাইরে থেকে যাবে। একটা বড় বৈশিষ্ট্য এই যে ক্ষেমতজুদের কাছে অনেকসময়ই ক্ষেতমজুর সমিতি ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার পার্থক্যটা বড় নয়। দুই লাল পতাকা তাদের চেতনায় একাকার। ক্ষেতমজুর সমিতির সদস্য হয়েই তারা বলে, আমরা কমিউনিস্ট! এদের ঠিকমত সংগঠিত করতে পারলে কমিউনিস্ট পার্টির বিন্যাসে (Composition) গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসবে। দেশের বামরাজনীতিতেও গুণগত পরিবর্তনের ধারা সূচিত হবে। তাছাড়া, ক্ষেতমজুরদের বরাতে গ্রামের অন্য সকল রকম দরিদ্র জনগণকে

সংগঠিত করারও এক বড় অনুকূল পরিবেশও বর্তমানে বাংলাদেশের কমিউনিস্টদের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

শোষিত জনগণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজতন্ত্রের চেতনা সৃষ্টি হয় না, তা' সেখানে নিয়ে যেতে হয়। ক্ষেতমজুর সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঢাকাবাসী নাগরিক এরকম অভিযোগের বিরুদ্ধে নেতৃত্বের ত্যাগ-তিতিক্ষা, ঝড়-বৃষ্টি-রোদ-কাদা উপেক্ষা করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে উল্কার মত সফরকে বাদ দিয়েও আমরা লেনিনের একটি ছোট উদ্ধৃতি দিতে চাই। লেনিন বলছেন, "গ্রাম অনিবার্যাভাবেই নগরকে অনুসরণ করে। একমাত্র প্রশ্ন হ'চ্ছে নাগরিক শ্রেণীগুলোর মধ্যে **কোন্ শ্রেণী** গ্রামকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে, এই দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে, এবং নাগরিক নেতৃত্ব কী রূপ গ্রহণ করবে।"[৭৭]

সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির গত ছয় বছরের কাজের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে এক্ষেত্রে চমৎকার সাফল্য এসেছে। হয়তো আরো অনেক কিছুই করার আছে, হয়তো আত্মসন্তুষ্টির কোনো অবকাশ এখনো সৃষ্টি হয়নি, তবুও গুটিকয়েক তরুণ শুধুমাত্র তাদের রাজনৈতিক কমিটমেণ্টে উদ্বুদ্ধ হয়ে এদেশের মূঢ়-ম্লান-মূক ক্ষেতমজুরদের মাঝে প্রতিবাদের ভাষা তৈরীতে যে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তাকে আগামীদিনের ইতিহাসবেত্তারা নিশ্চয়ই উচ্চ মূল্য দিয়ে যাবেন।

গ্রামে কাজ করার কথা এক সময় এদেশের চীনাপন্থীরাও খুব বলত। কিন্তু তাদের এ কাজ মূলতঃ ছিল কিছু রাজনৈতিক কর্মী নিয়ে গ্রামে "বিপ্লব" (!) করার চেষ্টা। ফলে উল্লেখ করার মতো কোনো কৃষক-আন্দোলনই তারা সৃষ্টি করতে পারেনি। তাছাড়া শহর অরক্ষিত রেখে (পুঁজিবাদের বিকাশের মূল ক্ষেত্রটা খোলা রেখে!) "গ্রামে-বিপ্লব-করতে-যাওয়া"(!)-র তাদের এই প্রবণতা সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় বুর্জোয়াদের বেশ কাজে এসেছে এবং একারণে

৭৭. ভি, আই, লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড-৩০, পৃ-২৫৭।

তারা সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে বেশ ভাল পিঠ চাপড়ানিও পেয়েছে, যা বিভিন্ন বুর্জোয়া ও এস্টাব্লিশমেন্টের পত্রিকাতে (যেমন "বিচিত্রা", "হলিডে", "রোববার") তাদের কভারেজ দেখলেই বোঝা যায়! এছাড়া রয়েছে সরকার ও সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এনজিও-দের বিশাল নেটওয়ার্ক ও অবিশ্বাস্য অঙ্কের সব অর্থ।

যাহোক, শুধুমাত্র যৌথতার চেতনাবোধ সৃষ্টি হওয়ার পরই রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে তা' ঠিক নয়। অনেক সময় রাজনৈতিক সংগঠন আগেও হতে পারে। এটা এক দ্বিপাক্ষিক ও দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া। এদেশে ক্ষেতমজুর সমিতি গড়ে ওঠার আগেই ক্ষেতমজুররা গম চুরি বা সামাজিক নির্যাতন ইত্যাদির বিরুদ্ধে বেশ কিছু তাৎক্ষণিক (spontaneous) আন্দোলন করলেও গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের রাজনীতির নিঃসন্দেহে এক বড় ঘটনা ক্ষেতমজুর সমিতির জন্ম ও দ্রুত আনুভূমিক বিকাশ। খুব স্বল্প সময়েই ক্ষেতমজুর সমিতি দেশের বৃহত্তম সংগঠনে পরিণত হয়েছে যার সদস্য সংখ্যা যে কোনো রাজনৈতিক দলের চেয়ে বেশী। ইতিমধ্যেই ৪৩টি জেলার ২৯০টি উপজেলার ৫,১১৬টি গ্রামে ক্ষেতমজুর সমিতি গঠিত হয়েছে। বর্তমানে সংগঠনটির সদস্য-সংখ্যা ৩ লক্ষাধিক ও অংশ গ্রহণ করানোর ক্ষমতা আরো প্রায় ৩ লক্ষের মত। এছাড়া প্রায় ৭/৮ হাজার গ্রামে পৌঁছানোর ক্ষমতা বর্তমানে ক্ষেতমজুর সমিতির রয়েছে। বস্তুতঃ ১৯৮১ সালের ১৮ই মার্চ প্রথম সম্মেলন হওয়ার পর থেকেই ক্ষেতমজুর সমিতিকে আর পিছনে তাকাতে হয়নি। বোঝাই যায়, বস্তুগত ভিত্তি তৈরীই ছিল।

এই বিকাশ এমনিতে হয়নি। প্রতিটি পর্যায়ে স্থানীয় ও জাতীয় ভিত্তিতে আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ক্ষেতমজুর সমিতি ক্ষেতমজুর শ্রেণীর মধ্যে গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছে। এ পর্যন্ত ক্ষেতমজুর সমিতি প্রায় দুই শতাধিক গম চুরি, তিন শতাধিক কাজ আদায়ের, অর্ধ-শতাধিক ইজারাদারীর বিরুদ্ধে, দুই শতাধিক ঘুষ, দুর্নীতি, মাছধরা ও প্রায় অর্ধ-শতাধিক স্থানীয় নির্যাতন প্রতিকার আন্দোলন করেছে। খাস জমির আন্দোলনে জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব

দিয়ে এ পর্যন্ত সারাদেশে প্রায় দশ হাজার একর খাস জমি দখলে এনেছে।

বোঝাই যায় যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্ষেতমজুর সমিতির কাজ চলে তবে আগামী দিনের বাংলাদেশের রাজনীতিতে বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতি একটা প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হবে।

তবে শাসকশ্রেণীও নিশ্চুপ বসে নেই। গ্রামের গরীবদের মধ্যে এনজিও-দের দ্বারা নানা বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। অন্যদিকে ক্ষেত-মজুর সমিতির বহু কর্মী ও নেতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হচ্ছে, মামলা-মোকদ্দমা ও প্রতিক্রিয়াশীলদের হামলার শিকার হতে হ'চ্ছে, স্থানীয় পর্যায়ে সইতে হ'চ্ছে নানা অপমান ও উপহাস। নাজিরপুরে ফজর আলী শহীদ হয়েছেন। চর গজারিয়ায়, চকোরিয়ার চরে, ডিমলার কুঠিডাঙ্গায়, রাজশাহীর চারগাছে, মতলবের চর কাশিমে, নোয়াখালীর চরে, রক্ত ঝরেছে। গুলী চলেছে তাহেরপুরে, ধর্মপাশায়, চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে।[৭৮]

তবে ক্ষেতমজুরদের মধ্যেও সংহতিবোধ বাড়ছে। বিগত বন্যার সময় উরির চরসহ উপকূল এলাকার ক্ষেতমজুররা যখন বিপর্যস্ত, তখন দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ক্ষেতমজুররা তাদের জন্য গম-গুঁড়োদুধ এসব রিলিফ নয়, সাহায্য হিসেবে পাঠিয়েছিল কাস্তে-কোদাল এইসব উৎপাদনের উপকরণ। শুধুমাত্র মেহনতী মানুষই বুঝতে পারে উৎপাদনের উপকরণের কি প্রয়োজনীয়তা! চেতনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত স্থানীয় সরকারের প্রায় জনা পঞ্চাশেক প্রগতিশীল ও "গরীবের পক্ষের লোক" সরাসরি ক্ষেতমজুরদের উদ্যোগী ভোটে চেয়ারম্যান-মেম্বর নির্বাচিত হয়েছেন। তেভাগা আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী রূপনারায়ণ রায় একদিন পার্লামেন্ট নির্বাচনে জিতেছিলেন, এবারের সংসদ নির্বাচনেও যে কয়েকজন কমিউনিস্ট প্রার্থী জিতেছেন, তার পেছনে নির্বাচনী অঞ্চলগুলোর ক্ষেতমজুরদের সক্রিয় ভোট একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

---

৭৮. সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতি, দ্বিতীয় জাতীয় ক্ষেতমজুর সম্মেলন, পৃ—৫।

যাকে বলে চোখ-কান খোলা, সেটাও ঘটছে। ক্ষেতমজুরদের মধ্যে জানা-শোনা-বোঝার আগ্রহ বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট সরকার কায়েম হবার পর সেখানে ক্ষেতমজুরদের জন্য বেকার-ভাতা, বৃদ্ধদের পেনশন, নিম্নতম মজুরী, বিধবা ভাতা, রেশন ইত্যাদি যেসব গণমুখী পদক্ষেপ সরকার নিয়েছে, সেসব অনেক তথ্যই সীমান্ত অঞ্চলের ক্ষেতমজুররা আপনাকে শুনিয়ে দেবে।

তবে সামগ্রিকভাবে দেখলে বলতে হয় যে, ক্ষেতমজুর আন্দোলনের শুধুমাত্র আনুভূমিক নয়, অনুলম্ব বিকাশও প্রয়োজন। আর এর জন্য প্রয়োজন তার রাজনৈতিক দিকটার বিকাশ ঘটানো। রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নে, জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে, তার আন্দোলনকে সম্পৃক্ত করা। তা'হলেই ক্ষেতমজুর আন্দোলন তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছতে পারবে।

ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করার সমস্যাসমূহ

এত সব কিছু বলার অর্থ এই যে, ক্ষেতমজুরদের বিপ্লবী ধারায় সংগঠিত করার কোনোই সমস্যা নেই! বরং সমস্যাগুলোকে খুব খাটো করে দেখলে আমরা নারোদনিকদের মতই দারিদ্র্যকে আদর্শায়িত করার ভ্রান্তির শিকার হতে পারি। অভিজ্ঞতা শেখায় যে একজন মানুষ গরীব হলেই বিপ্লবী হয় না। বরং নির্মম দারিদ্র্য তাকে অদৃষ্টবাদের দিকে ঠেলে দিতে পারে, 'ও-কিছু-হবার-নয়' জাতীয় সিনিক করতে পারে, তার রিলিফ-মানসিকতা বা ভিক্ষা-মনোবৃত্তি জাগাতে পারে, তাকে লুম্পেনে পরিণত করতে পারে কিম্বা তার মানবিক দিকগুলোকে ভেঁাতা করে তার বি-মানবিকীকরণ ঘটাতে পারে।

এক সময় এদেশের মাওবাদীরা দেশে দুর্ভিক্ষ হলে খুশী হয়েছে! এতে নাকি গরীব মানুষদের "বিপ্লবী চেতনা" (!) আরো তীক্ষ্ণ হবে!! এ ধারণা যে কত ছেলেমানুষী তা, অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। পঞ্চাশের সেই ভয়াবহ মন্বন্তরে লক্ষ লক্ষ মানুষ কলকাতা

শহরের ফুটপাতে কাৎরে মরেছে, পাশে সুসজ্জিত খাবারের দোকান, কিন্তু কোনো দোকান লুট হয়েছে এ রকম তথ্য জানা যায় না। এমনকি '৭৪ সালের ভুভিক্ষের সময়ও, মানুষ ধুঁকে মরেছে ('৭১ সালের অত রক্তক্ষয়ী ও জঙ্গী সংগ্রামের পরও), কিন্তু মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়নি।

এছাড়া ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করার কিছু সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক সমস্যাও রয়েছে।

যেমন, ধনীদের উপর নির্ভরশীলতার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। এক্ষেত্রে খাতক-পৃষ্টপোষক (Client-Patron) সম্পর্কগুলি তার শ্রেণী চেতনাকে ঝাপসা করে রাখে।

অনেক ক্ষেত্রেই তাদের রয়ে যায় কিছু কৃষক-মানসিকতা। পাঁচ-দশ বছর আগেও তারা সম্পন্ন কৃষক ছিল। বর্তমানে জমি-হাল-বলদ হয়তো নেই, কিন্তু সেই ক্ষুদে মালিকানার কৃষক-মানসিকতার রেশ হয়তো এখনও রয়ে গেছে যা মজুরীশ্রমিক হিসেবে তাকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সে এক নস্টালজিয়ায় ভোগে এবং অনেক ক্ষেত্রে স্বপ্ন দেখে যে আবার তার জমি-হাল-বলদ হবে এবং সে স্বচ্ছল কৃষক হবে, যা এক ইউটোপীয় কল্পনা মাত্র।

এছাড়া উন্নত প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করে না বলে তার চেতনা অনুন্নত থাকে, বিশেষ করে আমরা যদি কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে ক্ষেতমজুরদের তুলনা করি।

এক ব্যাপক সংখ্যক ক্ষেতমজুর ভ্রাম্যমান থাকে। অনেকে আন্তঃজেলা পর্যায়ে। এদেরকে কোথায় সংগঠিত করা? কর্মক্ষেত্রে না বাসস্থানে? এটাও এক সমস্যা।

ক্ষেতমজুরদের বিপ্লবী ধারায় সংগঠিত করার বিরুদ্ধে জামাতে ইসলাম ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলি নানা ধর্মীয় অপপ্রচার চালায়।

ক্ষেতমজুরদের সার্বিক বিপ্লবী ধারায় সংগঠিত হবার বিরুদ্ধে সারাদেশে মাকড়সার জালের মত ছড়ানো সাম্রাজ্যবাদের অর্থপুষ্ট এনজিও-রাও নানারকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে।

এছাড়া ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত হওয়ার বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রভাবশালী ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের চাপ তো রয়েছেই।

রয়েছে অতীতে রাজনীতিবিদদের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার ক্ষেতমজুরদের তিক্ত অভিজ্ঞতা।

এছাড়া দারিদ্র্যের যে প্রান্তস্থ সীমায় ক্ষেতমজুরদের অবস্থান, যেখানে প্রতি মুহূর্তেই অন্নের চিন্তা, সেখানে সমাজ-পরিবর্তনের চিন্তাটা অনেক সময়ই অনেক দূরের হয়ে পড়ে।

আর এক বড় সমস্যা হ'চ্ছে সারা বছর উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জড়িত নয় বলে এবং বছরের একেক সময় একেক রকম ছুটকো কাজ, যেমন হাটে-বাজারে এটা-ওটা বেচা-কেনা, ভ্যান-রিক্সা চালানো, মাটিকাটা ইত্যাদিতে জড়িত থাকে বলে ক্ষেতমজুরদের মধ্যে কিছু লুম্পেন ঝোঁকও রয়েছে। আর গ্রামাঞ্চলে নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ার সমান্তরালে চলছে এই লুম্পেন-প্রলেতারীয়করণ। শাসকশ্রেণী এটা ইচ্ছাকৃতভাবেই ঘটাচ্ছে। কারণ যুগে যুগে লুম্পেন-প্রলেতারীয়রাই স্বৈরাচারী রাষ্ট্র ও সরকার-ব্যবস্থার পক্ষে মূলতঃ কাজ করে থাকে।

এইসব সমস্যাকে অতিক্রম করেই ক্ষেতমজুরদেরকে সংগঠিত করার কঠিন কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

পেটি-বুর্জোয়া গ্রাম্য-বিলাস ও নারোদনিকীয় ঝোঁকসমূহ

তলস্তয় প্রসঙ্গে লেনিন বলেছিলেন, "ক্রমাগ্রসরমান পুঁজিবাদের কারণে জনগণের জীবন বিপর্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ উঠেছিল রুশ দেশের প্রত্যন্ত পিতৃতান্ত্রিক গ্রামাঞ্চল থেকে, সেই তাদের থেকে, যারা জমি থেকে উৎপাটিত হয়েছিল।"[১৯] বিভিন্ন দেশেই ক্রমাগ্রসরমান পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এই পিতৃতান্ত্রিক কৃষক সমাজের বিদ্রোহের ঝোঁক দেখা গেছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের দেশের অতীতের কৃষক-আন্দোলনগুলির কথাও আমরা বলতে পারি

---

১৯. ভি-আই-লেনিন, "লেভ তলস্তয়—রুশ বিপ্লবের আয়না।"

তবে ধনবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদের যুগে প্রবেশ করেছে তখন এই ধারার বিদ্রোহের সফলতা সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। নারোদনিক ও নিউ-পপুলিস্টরা ছিল এই ধারার প্রবক্তা যাদের বিরুদ্ধে লেনিনকে বিস্তর কলম ধরতে হয়েছিল। এ যুগেও কেউ কেউ তৃতীয় বিশ্বে এই ধারার বিপ্লবের তত্ত্বকে একটা সুনির্দিষ্ট রূপ দিতে চেয়েছেন। যেমন ফ্রানজ ফ্যাননের মতে, তৃতীয় বিশ্বের গ্রাম, নগরের মত সাম্রাজ্যবাদী কলুষিত প্রভাবের বাইরে রয়েছে। ফলে গ্রাম থেকেই বিপ্লবের শুরু হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে শহর 'অপবিত্র' ও গ্রাম 'পবিত্র' এ জাতীয় ধারণা অনেকখানিই "ফিরে-চল-গাঁয়ে" বা "দাও-ফিরিয়ে-সে-অরণ্য-নাও-ফিরে-এ-নগর"—এর মতই রোমান্টিকীকরণের দোষে দুষ্ট। রাজনৈতিকভাবেও তা' ভুল পদ্ধতি যে বিভ্রান্তি আমরা মাওবাদী-দের 'গ্রাম-দিয়ে-শহর-ঘিরে-ফেলা' নীতির প্রয়োগের অনিবার্য্য ব্যর্থ-তার মধ্যে লক্ষ্য করেছি। বহু মাওবাদী দল দীর্ঘদিন এই চেষ্টা করে বর্তমানে হতাশ ও তাত্ত্বিকভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। ফ্যাননও তৃতীয় বিশ্বের গ্রামবাসীদের বহুমূলকতা ও পরস্পরবিরোধী প্রকৃতি লক্ষ্য না করে তাদেরকে একদেহী ও অপরিবর্তনীয় কিছু মনে করে ভুল করেছেন। কারণ শহরে যেমন বুর্জোয়া, পাতিবুর্জোয়াদের বিপক্ষে রয়েছে শ্রমজীবী মানুষ, তেমনই গ্রামে রয়েছে আদর্শায়িত ও সহজ-সরল কৃষক-ক্ষেতমজুরদের পাশাপাশি জোতদার ও কুটিল মহাজনরা। তাই স্থানের অবস্থানটা বড় কথা নয়, শ্রেণীর অবস্থানটাই বড় কথা।

পেটিবুর্জোয়া বিপ্লবীদের অনেকেরই এই জাতীয় রোমান্টিক গ্রাম্য-বিলাস রয়েছে। গ্রামকে ব্যবহারের চেষ্টা বুর্জোয়াদেরও রয়েছে। আমলা-মুৎসুদ্দী বুর্জোয়ার প্রতিভূ জিয়াউর রহমান যেমন থেকে থেকেই গ্রামের জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলত, মাইলের পর মাইল হেঁটে নিজের দেশগ্রামের 'ইগো' ও ফিগার ঠিক রাখত!

জেনারেল এরশাদও ১৯৮৩ সালের ২৮শে নভেম্বর গুলির পর বলল যে, তার সরকার গ্রামের মানুষের উন্নতির জন্যে বদ্ধপরিকর! রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে সামরিক সরকারগুলো প্রায়ই এক

অভিযোগ তোলে যে গ্রামে নাকি এসব দলের ভিত্তি নেই। তারা শহরে ভীড় জমিয়েছে ইত্যাদি। বস্তুত: গ্রাম শাসক শ্রেণীর এক পলায়নী অজুহাত। এক বিমূর্ত দোহাই। ক্ষেতমজুর আন্দোলন একদিন প্রকৃত গ্রামকে রাজনৈতিক বাস্তবতায় আনবে। শাসক শ্রেণীর পায়ের নীচ থেকে গ্রামকে আচমকা সরিয়ে ফেলবে।

মোটামুটি গোটা বাংলাদেশে ক্ষেতমজুর আন্দোলনের ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ বিষয় অন্তর্ভূক্ত রইলেও এই আন্দোলন ঠিক এক-শিলাভূত নয়। স্থানভেদে কিছু বিভিন্ন ধারা রয়েছে। যেমন হাওড় এলাকা, উত্তর-বঙ্গের বরেন্দ্র এলাকা, উপকূলীয় এলাকা, আখ বা তামাকের অর্থকরী শস্যের (cash crop) এলাকা, নদী ভাঙ্গা, বড় শহরের কাছে, ইত্যাদি এলাকাভেদে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষেতমজুর আন্দোলনের বিভিন্ন দাবী আপেক্ষিক গুরুত্ব পাবে।

বিভিন্ন প্রবণতাও রয়েছে। যেমন চর এলাকা বা নদী ভাঙ্গা এলাকার (যেমন জামালপুরে যমুনার পারে) ক্ষেতমজুররা অধিকতর জঙ্গীপনার পরিচয় দেন। আবার এক সময় কৃষক-আন্দোলনের প্রধান ভিত্তি যাদের মধ্যে ছিল সেই হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখি জঙ্গীপনা আপেক্ষিকভাবে কম।

আবার সাংগঠনিক ব্যাপারে নারী ক্ষেতমজুরদের মধ্যে আন্তরিকতা বেশী পরিলক্ষিত হয়।

এছাড়া জেলাবিশেষে মধ্যপ্রাচ্যের টাকা গ্রামের সমাজে ক্ষেত-মজুর শ্রেণীর বিপক্ষে ভারসাম্যহীনতা আনছে। তাছাড়া সীমান্ত-অঞ্চলগুলিতে প্রায়-অবাধ চোরাকারবারের ক্ষেত্রে, চোরাকারবারের মূল শ্রমটা, অর্থাৎ মোট বওয়া থেকে শুরু করে পুলিশ-বি, ডি, আর-এর হাতে নির্যাতন ভোগটা পর্যন্ত গোটা বিপজ্জনক কাজটা কর্মহীন নিঃস্ব ক্ষেতমজুর ও তাদের বৌ-ঝিদের করতে হলেও আসল মুনাফাটা লুটছে দু-পারের রাঘব-বোয়াল সমাজবিরোধী ও প্রশাসনের লোকেরা।

এটা ইতিবাচক যে ক্ষেতমজুরদের মধ্যে দ্রুতই সামাজিক সচেনতা বাড়ছে। সমিতির উদ্যোগে চাঁদা তুলে গরীব ক্ষেতমজুরের মেয়েকে

বিয়ে দেয়ার একাধিক ঘটনাও ঘটেছে। বড় লোকেরা ঈদের দিনে গোশ্‌ত খায়। ক্ষেতমজুররাও একাধিক জায়গায় যৌথভাবে চাঁদা উঠিয়ে ঈদের দিনে গরু কোরবানী দিয়েছে।

সমবায়—আশু মুক্তির পথ

সামাজিক ভূমি-ব্যবহারে ছোট চাষীদের জন্য মার্কস ও এঙ্গেলস একদিন অন্তর্বর্তী রূপ হিসেবে সমবায়ের ধারণাটি গুরুত্ব দিয়ে সামনে আনেন এবং সমাজতান্ত্রিক সমবায়ের তাত্ত্বিক মূলনীতি রচনা করে যান। ১৮৮৬ সালে আ. বেবেলের কাছে এক চিঠিতে এঙ্গেলস লিখেছিলেন, "পূর্ণ কমিউনিস্ট অর্থনীতিতে যেতে হলে অন্তর্বর্তী ধাপ হিসেবে আমাদের যে ব্যাপকভাবে সমবায়ভিত্তিক উৎপাদন অবলম্বন করতে হবে, এ ব্যাপারে মার্কস ও আমার কখনো কোনো সন্দেহ ছিল না"।[৮০]

তবে যেহেতু পুঁজিবাদের ভেতরে পুঁজিবাদী সম্পর্কেরই পুনর্জন্ম দেয়ার একটা প্রবণতা থাকে সমবায়ের, কেননা পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় পুঁজি নিজেই একটা রাজনৈতিক শক্তি এবং উৎপাদন ও ক্রেডিটের ক্ষেত্রে তা' অনিবার্যভাবেই একটা প্রভুত্বকারী শক্তি হিসেবে আভির্ভূত হয়, এই কারণে পুঁজিবাদী সমাজের ভেতর সমবায়মূলক উদ্যোগ আবার নিজেই একটা নিছক পুঁজিবাদী উদ্যোগে অধঃপতিত হতে পারে। এ কারণেই মার্কস ও এঙ্গেলসের অভিমত ছিল যে পুঁজিবাদের ভেতরে গোটা সমাজের আয়তনে উৎপাদনের নতুন পদ্ধতিতে চলে যেতে ও পুঁজির সঙ্গে স্বাধীন লড়াই চালাতে সমবায় অক্ষম। মার্কস লিখেছেন, "সমবায় ব্যবস্থা পুঁজিবাদী সমাজকে কখনো রূপান্তরিত করতে পারব না।"[৮১]

তবে শ্রমজীবী মানুষ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারলে অবস্থাটা ঘুরে যায়—সমবায় তখন সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

---

৮০. মার্কস-এঙ্গেলস রচনাবলী, খণ্ড-৩৬, পৃ—৩৬১।
৮১. মার্কস-এঙ্গেলস রচনাবলী, খণ্ড-১৬, পৃ—১৯৯।

হয়ে ওঠে, যেমন তা' হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নে, চীনে, বুলগেরিয়ায়, ভিয়েতনামে। কারণ, সমবায় হ'চ্ছে হাতে-কলমে যৌথ অর্থনীতির কর্মপদ্ধতি শেখার প্রাথমিক বিদ্যালয়। এছাড়া ব্যক্তিগত জোতের চেয়ে সমবায়ের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ স্থাপন সহজ। এসব কারণে মার্কসবাদীরা সঙ্গতভাবেই সমবায়ের প্রতি আকর্ষিত হয়েছেন। লেনিনকে তাই দেখি সমবায়ের পক্ষে শক্ত হাতে কলম ধরতে।

লেনিন বলছেন যে, সমবায় পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার একটা অংশ হলেও সামাজিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তনে সমবায়ের চরিত্রও পাল্টে যায়। এর মূল কারণ দুটি,

(ক) সমবায়ে বেড়ে ওঠে গরীবদের সংখ্যা;

(খ) শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতার আমলে বিকশিত ও সমাজতান্ত্রিক শিল্পের সঙ্গে সংলগ্ন হওয়ায় সমবায় হয়ে দাঁড়ায় সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্কের একটা রূপ, পরিণত হয় বুর্জোয়ার সঙ্গে সংগ্রামের হাতিয়ারে। তাই দেখি ১৯২১ সালে লিখিত "খাদ্য কর প্রসঙ্গে" পুস্তিকায় লেনিন সমবায়কে গণ্য করেছেন এক ধরণের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ বলে।

তবে সমবায় সম্পর্কে লেনিনের এই দৃষ্টিভঙ্গী তৎকালীন অতি-বাম ও দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ এই উভয় দিক থেকেই আক্রান্ত হয়েছিল।

ত্রৎস্কি জিনোভিয়েভের মত অনুযায়ী বিপ্লবোত্তর রুশ দেশে "মাঝারি চাষী ভেসে গেছে" (!), ফলে সমবায় গড়লে তা' শুধুমাত্র ধনী কৃষক ও কুলাকদেরই সাহায্য করবে।

আর বুখারিনদের মত ছিল যৌথখামার বা উৎপাদনী সমবায় নয়, বিক্রয়-সরবরাহ ধরণের সমবায়ই কৃষকদের সমাজতন্ত্রে আনার রাজপথ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের যৌথ-খামারের পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে তাঁর অতি-বাম ও দক্ষিণপন্থী সমালোচকদের চেয়ে লেনিনের সমবায় নীতি কতখানি সঠিক ছিল।

দক্ষিণপন্থীরা যে ধারায় সমবায়ের সুপারিশ করে সেই ক্রেডিট বা পরিভোগী ব্যবসায়ী সমবায়ে তার প্রকৃতিগত পেটি-বুর্জোয়া চরিত্র প্রকট হয়ে উঠতে পারে, যেমন তা' হতে দেখা যায় স্ক্যাণ্ডিনেভীয় কৃষি-সমবায়গুলির ক্ষেত্রে।

তাই প্রয়োজন সমবায়ের সরলতম রূপ (যেথা পরিভোগী, বিক্রয়মূলক বা ক্রেডিটমূলক) থেকে উচ্চতর রূপে (উপভোগী) উত্তরণ, আর তা' ঘটে কেবল জমির সামাজিক কর্ষণে। অবশ্য কেবলমাত্র জমির যৌথ-চাষই সমবায় নয়, সমবায় একটা সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও মানবিক বোধ, যেরূপ উত্তরণ সম্ভব কেবলমাত্র উচ্চতর ধরণের—উৎপাদনী সমবায় মারফতই। যেমন, যৌথভাবে জমি চাষের সমিতি। ঠিক যে কাজটিই আজ দখলকৃত খাস জমি নিয়ে ক্ষেতমজুর সমিতি করতে চাইছে।

আমাদের দেশে আমরা এক সময় কুমিল্লা মডেল বা বর্তমানে আই আর ডি পি ধরণের সমবায় দেখছি। এতে মূলতঃ স্বচ্ছল কৃষকরাই থকেছে এবং তা' গ্রামাঞ্চলে ধনবাদী বিকাশকে সহায়তা করছে। এমনকি পাকিস্তান আমলের মত প্রতিক্রিয়াশীল আমলেও বি এ ডি সি, ওয়াপদা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে কৃষি-উপকরণ কৃষকদের নিকট পৌঁছানোর জন্য গ্রহণ করতে হয়েছিল সমবায়ের মাধ্যম। তবে আমাদের দেশের সরকারের সমবায় আইন এমনই শ্রেণীসচেতন যে বর্তমান সমবায় আইনে নিঃসম্বল ক্ষেতমজুরদের সদস্য হওয়ার অধিকারটুকু পর্যন্ত নেই! কুমিল্লা সমবায়ে ভূমিহীন ও ক্ষেতমজুরদের তো প্রায় কোনো ভূমিকাই নেই এবং এ জাতীয় সমবায় ক্ষুদে চাষীদের চেয়ে বড় জোতের মালিকদেরই যে বেশী লাভবান করেছে, সে বিষয়ে অনেক অর্থনীতিবিদই একমত।

সারা দেশে আই, আর, ডি, পি সমবায় প্রসঙ্গেও কিছু বলা প্রয়োজন। আই, আর, ডি, পি-র উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছিল যে, আধা-সামন্তবাদী সমাজের ভূ-স্বামী ও মহাজনদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে কৃষকেরা যাতে নিজেদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে শক্তিশালী হতে পারে সেই ধারায় সমবায়-

গুলি গড়ে উঠবে। আরও বলা হয়েছিল, "যদিও এই কর্মসূচী ক্ষেতমজুরদের বা এ স্তরের কৃষকদের অবস্থায় উন্নয়নে সরাসরি কোন সাহায্য করবে না, তবে কৃষি-শ্রমিকদের বর্ধিত চাহিদা ও চারপাশের সমৃদ্ধি তাদের ভাগ্যোন্নয়নে সাহায্য করবে।"[৮২]

বলার অপেক্ষা রাখে না এসব 'মহৎ' উদ্দেশ্যের কিছুই সাধিত হয়নি, যদিও আমরা দেখছি যে আই, আর, ডি, পি বেশ দ্রুতই বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮২ সালে সেখানে আই, আর, ডি, পি, সমবায়ের সংখ্যা ছিল ৪৪,১১১ সেখানে ১৯৮০ সালের ৩০শে জুন আই, আর, ডি, পি-র কৃষি-সমবায়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২,৯৭,২১৪।[৮৩] ১৯৭২ সালে আই, আর, ডি, পি কাজ করত ৫৩টি থানায়, ১৯৮০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩০০টি থানায়।[৮৪]

এক সময় তৃতীয় বিশ্বের ক্ষেত্রে জওহরলাল নেহরুর বহুল-আলোচিত "সমবায়-সমাজতন্ত্র"-র ধারণাকে আদর্শস্থানীয় বলে প্রচার করা হো'ত। নেহরুর উদ্যোগী সমবায়-প্রীতির কারণে ভারতে সমবায়ের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পায়। ২০ বছরে ভারতে, ১৯৫১ সালে যেখানে সমবায় ছিল ১ লক্ষ ৮০ হাজার ও শেয়ার-হোল্ডারের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৩৭ লক্ষ, ১৯৭৯ সালে তা' বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩ লক্ষ ও ৬ কোটি ২০ লক্ষে, অর্থাৎ চার-পাঁচ গুণ।

তবে ক্ষেতমজুর সমিতি বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে আপাততঃ যে সমবায়ের ইচ্ছা পোষণ করে, তা' বর্তমান আইআরডিপি-জাতীয় সমবায় নয়, নয় নেহরুর 'সমবায়-সমাজতন্ত্র'-ও, যা মালিকানা-ভিত্তিক। তা'কে হতে হবে—শ্রমভিত্তিক। এক্ষেত্রে বরং বুলগেরিয়ার কৃষি সমবায়গুলির অভিজ্ঞতা থেকে কিছু নেয়া যেতে পারে, যেখানে সমবায়ের আয়-বণ্টনের ক্ষেত্রে জমি বাবদ দেয়া হয় ৪০% ও শ্রম বাবদ ৬০%। একই সঙ্গে শ্রম ও মালিকানাভিত্তিক আয়-

---

৮২. উৎস. I R D P—Proposals for the First Five Year Plan, Part-iii, 1973, উদ্ধৃত, অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ—১৩৪।

৮৩. অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ—১৩৩।

৮৪. ঐ, পৃ—১৩২।

বণ্টনের ধারণা ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু-ঘোষিত বাকশাল কর্মসূচীতেও ছিল। বাকশাল কর্মসূচীতে গ্রামে বাধ্যতামূলক বহুমুখী কৃষি-সমবায় (যেখানে ভূমিহীনরাও সদস্য হবে) আয়ের বণ্টন ছিল নিম্নরূপ ; সকল উৎপাদিত আয়কে তিন ভাগ করে এক ভাগ বিতরিত হবে মালিকানার ভিত্তিতে, এক ভাগ শ্রমের ভিত্তিতে ও এক ভাগ যাবে সমবায়ের যৌথ তহবিলে।

তবে যেহেতু ক্ষেতমজুর সমিতির সমবায়গুলিতে ক্ষেতমজুররাই প্রধান শক্তি, তাই তাদের গড়া সমবায় শ্রম প্রশ্নে আরো প্রাগ্রসর হবে, অন্ততঃ সেটাই—কাম্য। ক্ষেতমজুর সমিতি যে সমবায়ের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে, তা'র মূলতঃ দু'টি কারণ,

(ক) আমাদের দেশে জমির পরিমাণ সীমিত। জমি সবাইকে দেয়া যাবে না। লাঙ্গল ঘোরানোই অসম্ভব হবে। যান্ত্রিক চাষাবাদ সম্ভব হবে না। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ব্যাহত হবে।

(খ) সমবায় সমাজতান্ত্রিক মূলবোধের প্রাথমিক শিক্ষা দেবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই ক্ষেতমজুর সমিতির দাবী খোদ কৃষক ও ভূমিহীনদের হাতে জমি ও সমবায় গঠন। এ পর্যন্ত ক্ষেতমজুর সমিতির পরিচালনাধীন ৫০/৬০টি সমবায় রয়েছে এবং প্রায় সবগুলিই মূলতঃ শ্রমভিত্তিক। লেনিনের মত ছিল সকল সমবায়ের মধ্যে উৎপাদনী সমবায়ই সেরা। ক্রেডিট ও বাজারজাতকরণ সমবায় প্রাথমিক সমবায় মাত্র। সেদিক থেকে ক্ষেতমজুর সমিতির দখলীকৃত জমির সমবায়গুলি শুরু থেকেই উৎপাদনমুখী ও বিপ্লবী সম্ভাবনাপূর্ণ।

অবশ্য পাশাপাশি এটাও সত্য যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অধীনে কোনো সমাজতান্ত্রিক ঘেরটোপ (enclave) এস্টাব্লিশমেন্ট সহ্য করবে না। তাই এসব সমবায়কে প্রতি মুহূর্তেই নানা প্রশাসনিক, আইনগত, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হ'চ্ছে।

এছাড়া অনেক ভূমিহীনদের মধ্যে কিছু অকৃষিজ সমবায় গড়ার প্রবণতা রয়েছে। মূলতঃ এনজিও-রাই এসব অকৃষিজ সমবায়ের

মূল উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক। কিছু আর্থিক লাভের ব্যাপার থাকলেও এই সব অকৃষিজ সমবায়ের পেটি-বুর্জোয়া চরিত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

ক্ষেতমজুররা মূলতঃ নিজেদেরকে সেইসব সমবায়েই সংযুক্ত করবে যা হবে উৎপাদনমুখী ও শ্রমভিত্তিক। দেশে বর্তমানে যে হাজার হাজার একর খাস জমি ক্ষেতমজুররা দখল করছে, সে সবে আদর্শস্থানীয় সমবায় গড়ে তোলার একটা চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জমি, শ্রম ও পুঁজির সুসমন্বিত উপাদান নিয়ে এইসব আদর্শস্থানীয় সমবায়ের তত্ত্বগত ও কাঠামোগত রূপরেখা নির্ধারণ করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব বর্তমানে—ক্ষেতমজুর সমিতির উপর বর্তেছে।

সমবায়—কারণ উদ্ধারকৃত খাস জমি ব্যক্তিখাতে দিয়ে ক্ষেতমজুরদের আবার ক্ষুদে কৃষক বানিয়ে তাদের সম্ভাবনাকে নষ্ট করা ঠিক হবে না। তবে পাশাপাশি আইআরডিপি-জাতীয় সমবায় দিয়েও বর্তমান খাস জমির সমবায়ের সমস্যা সমাধান করা যাবে না। তাই শুরু থেকেই এই সমবায়কে হতে হবে যৌথ মালিকানাভিত্তিক ও উৎপানমুখী। তাগিদটা জরুরী, কারণ প্রতিদিনই নতুন নতুন খাস জমি ক্ষেতমজুর সমিতির দখলে চলে আসছে।

তবে একটা প্রতিকূল রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ভেতরে এরকম যৌথতামুখী উৎপাদনী কৃষি-সমবায় কতখানি সম্ভব অর্থাৎ মেহনতী মানুষের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন একটা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ভূমিহীনদের সমবায়ের এই প্রগতিশীল ঘেরটোপ (enclave)-টি যে সহ্য করবে না, এবং তা নস্যাতের নানা চেষ্টাই নেবে, সে সম্পর্কে ক্ষেতমজুরদের সচেতন করেই এই সমবায়-প্রচেষ্টা নেয়া উচিত। অন্ততঃ যেন কোনো মোহ না থাকে। তা' হলে কোনো কারণে (যে রকম বহু কারণ এই প্রতিকূল সমাজ-কাঠামোর ভেতরে রয়েছে) সমবায়টি ব্যর্থ হলে, হতাশা বৃদ্ধি পাবে।

আগে সমবায় গড়তে চাইলে কর্তৃপক্ষ যেমন বলত আগে জমি দেখান। আর জমির দাগ, খতিয়ান নম্বর চাইলে বলত, আগে

সমবায়ের রেজিষ্ট্রেশন দেখান !! এখন এই মুরগী-আগে-না-আণ্ডা-আগের ভেল্কিবাজী কেরানীবাবুরা আর দেখাতে পারবেন না, কারণ ক্ষেতমজুররা খাস জমির প্রকৃত দখল নিয়েই বর্তমানে সমবায় গড়তে যাচ্ছেন। তবে এক্ষেত্রে কিছু অন্য ধরনের বাস্তব সমস্যা আছে।

যেমন, খাস জমিগুলি সাধারণতঃ নিম্নমানের হয়। জলসেচ বা জল নিষ্কাশন ছাড়া সব সময় চাষাবাদ সম্ভব হয় না। অথচ ক্ষেতমজুরদের পাওয়ার-পাম্প কেনার পয়সা নেই।

খাস জমি দখলের পর চাষাবাদ শুরুর জন্যে প্রাথমিক যে পুঁজি লাগে, তাও ক্ষেতমজুরদের নেই। এই পুঁজির সঙ্কট একটা বড় সঙ্কট হিসাবে দেখা দেয় যখন একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বীজধান বা জলসেচের ব্যবস্থা না করতে পারলে জমি চাষ অর্থহীন হয়ে পড়ে।

তাছাড়া সমবায়ের তহবিলের হিসাব-পত্র (শ্রম ও অর্থ উভয়েরই) যথাযথভাবে রাখা অর্থাৎ এই স্পর্শকাতর ম্যানেজারিয়াল কাজটা বেশ দুরূহ। আর এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র ভুল-ত্রুটি বিশ্বাসযোগ্যতায় ফাটল ধরাবে এবং সে কারণে গোটা উদ্যোগটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

তারপরে রয়েছে সমবায় সম্পর্কে দেশের প্রচলিত আইন-কানুনের হাজার রকম লালফিতার দৌরাত্ম।

এক্ষেত্রে অতীতে আমাদের দেশে কৃষক-ভূমিহীনরা নিজস্ব উদ্যোগে যেসব সমবায় করেছিলেন তা' থেকে কিছু শিক্ষা নেয়া যেতে পারে। তবে এটা ঠিক যে উপর থেকে উদ্যোগ নিয়ে অল্পকিছু সমবায়ের উদাহরণ আমাদের দেশে থাকলেও তলা থেকে সমবায় গড়ার উদাহরণ তেমন নেই।

স্বাধীনতার পর কৃষক সমিতি দ্বারা রায়পুরা, চুরাইল এরকম কিছু সমবায় গড়ার ছোটখাট অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে এসব অভিজ্ঞতা সর্বদা তেমন সাফল্যজনক হয়নি। একই কথা বলা যেতে পারে ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জের মল্লিকপুরের সমবায়ের কথা। এগুলো থেকে এই শিক্ষাই বেরিয়ে আসে যে প্রগতিশীল সমবায়কে শুধুমাত্র ঋণনির্ভর হলে চলবে না, তাকে স্থানীয়ভাবে নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ ও তা' প্রয়োগ করতে শিখতে হবে।

বস্তুতঃ ধর্মগোলার ঐতিহ্যের এই দেশে চার আনা আট আনা করে দুদিনের জন্যে জমিয়ে রেখে সমবায় করার একটা তাগিদ ক্ষেত-মজুরের মধ্যে রয়েছে। নতুন দখলীকৃত খাসজমি নিয়ে সমবায় গড়ার বিষয়গত একটা সুবিধা এই তাগিদের মধ্যে রয়েছে। তবে পাশাপাশি ক্ষেতমজুরকে এটাও বোঝানো চাই যে জমি সমস্যার মাঝে তার ভাগ্যের সমাধান নেই। সমবায় আপাত লক্ষ্য মাত্র। বিপ্লবটাই মূল কথা।

সমাজ-বিপ্লব—মুক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্য

সেই পাকিস্তান আমল থেকেই কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির ব্যাপারে সামরিক-বেসামরিক আমলা-মুৎসুদ্দী সরকারগুলো কিছু সুনির্দিষ্ট নীতি নিয়ে এগিয়েছে। আর আমরা আগেই বলেছি যে বাংলাদেশের ভূমিহীনদের আজ নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া যে চরমে পৌঁছেছে, তা' সরকারী নীতির অনুপস্থিতি নয়, বরং ওই সব নীতিরই সুনির্দিষ্ট ফলশ্রুতি।

তবে গ্রামকে শুষে নগরের বিলাস বাড়ানোর 'ফেস পাউডার ইকনমি' বাংলাদেশে ব্যর্থ হতে বাধ্য। বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান বা সিঙ্গাপুর হবে না। বিশ্ব ব্যাঙ্কের তাঁবেদার অর্থনীতি-বিদরা নীচের দিকে উন্নয়ন 'চুঁইয়ে পড়া' (tickle down)-র যে তত্ত্ব দিয়েছিলেন, গ্রাম-বাংলার কোটি কোটি কংকালসার ক্ষেতমজুর পরিবার আজ তার ব্যর্থতার প্রমাণ। উন্নয়ন নীচে চুঁইয়ে পড়েনি, বঙ্গবন্ধুর ভাষায় "চাটানের দল" তা' মাঝপথেই চেটে খেয়ে শেষ করে ফেলেছে।

স্বাধীনতার পনেরো বছর পরেও দেশ খাদ্যে পরনির্ভরশীল। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা প্রকৃতির সামান্য খামখেয়ালীতে দুর্ভিক্ষ অব-ধারিত। প্রতি বছর ১৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করতে হয়। এটা ঠিক যে ১৯৬৯-৭০ এর তুলনায় খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে ২১% কিন্তু জনসংখ্যা আবার বেড়েছে ৪২%। অবশ্য

আমরা আগেই বলেছি যে জনসংখ্যাকেই আমরা নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ার একমাত্র বা মূল সমস্যা বলে মনে করি না। কারণ বাংলাদেশে ভূমিহীনের সংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখা যায় জনসংখ্যার সাধারণ বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশী। কারণ, এটা অর্থনীতির একটা দিক নয়, এটা হো'ল, যেমন একজন অর্থনীতিবিদ বলেছেন, "বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন স্তরের সমস্যাবলীর একটি যোগমূলক (cumulative) বহিঃপ্রকাশ"[৮৫] মাত্র। মূল সমস্যা তাই জনসংখ্যা নয়। মূল সমস্যা—সমাজ-কাঠামো।

এই সমাজ-কাঠামোর খোল-নালচেটা পাল্টে ফেলা দরকার। আর ক্ষেতমজুর আন্দোলনকে চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে সেই কাজটাই করে যেতে হবে। আমরা আগেই বলেছি ক্ষেতমজুর আন্দোলন মধ্যবিত্তের 'সুখী নীলগঞ্জ' প্রকল্প জাতীয় গ্রাম-বিলাস নয়, নয় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের 'ষোলো সিদ্ধান্ত' কিম্বা বুদ্ধদেবের নয়টি বাণী। ক্ষেতমজুর আন্দোলন হ'চ্ছে তীব্র শ্রেণী-দ্বন্দ্বে ভরপুর এক জঙ্গী শ্রেণী-সংগ্রাম। এই আন্দোলনকে তাই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে একটা বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগঠনের লেনিনীয় নীতির বিভিন্ন কৌশল রপ্ত করেই। এগিয়ে, পিছিয়ে, প্রয়োজনে আপোষ করে (বড় বিজয়ের লক্ষ্যে), প্রয়োজনে রুদ্র মূর্তি ধারণ করে এবং সর্বদাই, লেনিন যেরকম বলেছেন, "বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক বিপ্লবের বাস্তব পরিবেশ বিশ্লেষণ করে।"[৮৬]

তবে শোষকশ্রেণীও বসে নেই। বিপদটা তারা বোঝে। সাম্রাজ্যবাদ তাই গ্রামাঞ্চলে নানা এনজিও বানিয়ে রেখেছে। সামরিক রাষ্ট্র-প্রধানরা ভূমিহীনদের জন্যে টেলিভিশনের বক্তৃতায় কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করছে। পেশাদার মোল্লাদের ভাড়া করে মুরগী-পোলাও খাইয়ে ক্ষেতমজুর আন্দোলনের বিরুদ্ধে ওয়াজ-মাহ্‌ফিল করাচ্ছে। ভারতে আমরা চরণ সিং-এর দলের মধ্যে ধনী কৃষকদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব দেখতে পাই। বাংলাদেশে শুধু কুলাক ধনী কৃষকদের

---

৮৫. "বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা", নজরুল ইসলাম, পৃ—১১১।

৮৬. ভি, আই, লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড—২৩, পৃ—৬০।

স্বার্থ দেখছে এরকম কোনো একক রাজনৈতিক দল নেই বটে (যদিও দিনাজপুরে একটা "জোতদার সমিতি" রয়েছে !), তবে এই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব সর্বদাই মন্ত্রীসভায় বা প্রশাসনের উচ্চক্ষমতায় ছিল এবং আছে। এছাড়া ওরা সরকার, বা বিরোধী জোটে রয়েছে, এমন অনেক বুর্জোয়া ও পাতিবুর্জোয়া দলের ভেতরেই শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে।

আর যেহেতু আমাদের দেশ বিগত তিরিশ বছরের মধ্যে প্রায় সাতাশ বছরই শাসিত হয়েছে সামরিক শাসকদের দ্বারা, ফলে তাদের শ্রেণী অবস্থানটাও গুরুত্বপূর্ণ। ক্যান্টনমেন্ট-নির্ভর আমলা-মুৎসুদ্দী পুঁজির এইসব শাসকেরা শুরু থেকেই জনবিচ্ছিন্ন। এই জনবিচ্ছিন্নতা কাটাতে তারা "পল্লীর বন্ধু" (!) সাজতে চায়। বর্তমান সরকারও সেই লক্ষ্যে কাজ করছে। আর এক্ষেত্রে গ্রামের ধনিকদের মধ্যে তারা একটা রেডিমেড মিত্র পেয়ে যায় যারা সব আমলেই সরকারী দল করতে প্রস্তুত। জনবিচ্ছিন্ন গণবিরোধী সরকারের পায়ের নীচে থেকে গ্রামকে সরিয়ে ফেলতে হবে। ঐতিহাসিকভাবে, ক্ষেতমজুর সমিতির উপর সেই বড় দায়িত্ব বর্তেছে। মার্কস "অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে" গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন,

"কোন সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে যতোটা উৎপাদনশক্তির স্থান হতে পারে তার সমস্ত কিছুর বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত সেই সামাজিক ব্যবস্থার কখনও বিলুপ্তি ঘটে না, আর নতুন উন্নততর উৎপাদন সম্পর্কের আবির্ভাবও ঘটতে পারে না যতক্ষণ না পুরনো সমাজের গর্ভের মধ্যেই তেমন সম্পর্কের অস্তিত্বের বৈষয়িক শর্ত পরিপক্ক হয়ে উঠছে। সুতরাং মানবজাতি সর্বদা সেই কর্তব্যেই প্রবৃত্ত হয় যার সমাধান সম্ভব—কেননা কর্তব্যটা দেখা দেয় শুধু তখনই যখন তার সমাধানের বৈষয়িক শর্তগুলো ইতিমধ্যেই বর্তমান কিম্বা গড়ে উঠতে শুরু করেছে।"[৮৭]

আজ ক্ষেতমজুর সমিতির জন্ম ও দ্রুত বিকাশ এবং বিভিন্ন দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠাটাই প্রমাণ করছে যে "বৈষয়িক শর্ত"-সমূহ

---

৮৭. মার্কস-এঙ্গেলস নির্বাচিত-রচনাবলী, খণ্ড-৪, পৃ—১৪০।

পরিপক্ক হয়ে উঠছে, এখন প্রয়োজন শুধু সমাজ-বিপ্লবের লক্ষ্যে এই শক্তির সূচীমুখ আরো তীক্ষ্ণ করা।

সমাজ-বিপ্লব ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম একসূত্রে গাঁথা

অতীতে আমাদের দেশে বড় বড় যেসব কৃষক আন্দোলন হয়েছে তা' হয়েছে মূলতঃ উপজাতি, সংখ্যালঘু ও সমাজের প্রান্তস্থ অংশ নিয়ে—সাঁওতাল, হাজং, টঙ্ক। মসজিদ-কেন্দ্রিক পূর্ব-বঙ্গের গ্রাম-সমাজের মূল অংশটা তা' তেমন নাড়াতে পারেনি। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ক্ষেতমজুর আন্দোলন। রক্ষণশীল, এমনকি, প্রতিক্রিয়াশীল গ্রামগুলিতেও তা' ছড়িয়ে পড়েছে। বস্তুতঃ যেখানেই শ্রম-শোষণ আছে, সেখানেই শ্রেণী-ঘৃণা আছে। প্রয়োজন শুধু তাকে চিহ্নিত ও সংগঠিত করতে পারা।

বুর্জোয়া সমাজবিদ্ ম্যাক্স ওয়েবারের মত ছিল মালিকানা সামাজিক পদমর্যাদার জন্ম দেয় মাত্র। কিন্তু মার্কসবাদীরা মনে করেন যেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, সম্পত্তির মালিকানা সেই রাজনৈতিক ক্ষমতারও জন্ম দেয়। ক্ষেতমজুর আন্দোলন তাই সঙ্গতকারণেই রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনে প্রত্যাশী হবে এবং সেকারণেই অবশ্যাম্ভাবীভাবেই এস্টাব্লিশমেন্টের দ্বারা প্রতি পদে পদে রাজনৈতিকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হবে। ক্ষেতমজুরদেরও তাই বিভিন্ন রাজনৈতিক অস্ত্রগুলির সঠিক ব্যবহার জানতে হবে। এমনই এক অস্ত্র—নির্বাচন। আমরা অতীতে সব সময় দেখেছি যে স্থানীয় সরকারের নির্বাচনগুলোতে ধনী ও উদ্বৃত্ত কৃষকরাই চেয়ারম্যান-মেম্বর হয়েছে। বিগত নির্বাচনটা কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল এই অর্থে যে ক্ষেতমজুর-গরীব কৃষকেরা নিজেদের পয়সা খরচ করে প্রায় শতাধিক চেয়ারম্যান-মেম্বরদের জয়যুক্ত করাতে সক্ষম হয়েছিল।[৮৮]

ক্ষেতমজুর আন্দোলনকারীরা জানেন যে তাদের আন্দোলনের

---

৮৮. ক্ষেতমজুর সমিতির সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট, দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন, ১৯৮৬, পৃ—৩০।

সাফল্যতার অনেকখানিই নির্ভর করবে গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন বর্গের সঙ্গে তাদের আন্তঃসম্পর্কের উপর। এ ব্যাপারে ঐক্য যত ব্যাপক হবে, ক্ষেতমজুর আন্দোলনের বিজয়ের সম্ভাবনাও তত বেশী। এই লক্ষ্যেই মানবতাবাদী, বিবেকবান, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক মূল্য-বোধে উদ্বুদ্ধ সকল মানুষ, গ্রামের ডাক্তার-মাস্টার-পোস্টমাস্টার-ছাত্র যুবক ও জনদরদী লোকজনের সঙ্গে ক্ষেতমজুরদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে হবে।

ইদানীং দেশের অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে ক্ষেতমজুরদের ব্যাপারে বেশ আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গবেষণা, সন্দর্ভ, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, লেখালেখি বেশ হ'চ্ছে। অবশ্য এসবের অনেক বুদ্ধিজীবীর গবেষণাই মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদের ফর-মায়েশী কাজ। ফলে বই-কেতাব লিখে, অনেকে বিদেশ ভ্রমণ ও ডক্টরেট পেলেও যাদের নিয়ে লেখা সেই ভুখা-নাঙ্গা ক্ষেতমজুর রয়ে যাচ্ছে যে তিমিরে সেই তিমিরেই। তবে এঁদের মাঝে যারা দেশপ্রেমিক ও আন্তরিক বুদ্ধিজীবী রয়েছেন, তাদের সঙ্গে ক্ষেতমজুর আন্দোলনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে পারলে ক্ষেতমজুর আন্দোলন উপকৃত হবে।

অবশ্য সাম্প্রতিকালে ক্ষেতমজুর আন্দোলন জাতীয় পর্যায়ে বুদ্ধিজীবী ও মানবতাবাদীদের দৃষ্টি আকর্ষণে বেশ সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। আইনগত কিছু সাফল্যও অর্জিত হয়েছে। দু'টির কথা তো বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। একটি হো'ল ক্ষেতমজুরদের জন্য "নিম্নতম মজুরী আইন" ও অন্যটি হো'ল খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে স্থায়ী বিতরণ সম্পর্কে সরকারী ঘোষণা। ভূমি-সংস্কারের মূল দাবীর ক্ষেত্রেও সামান্য কিছু অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

অর্থনীতিবিদ মাত্রেই স্বীকার করবেন যে বাংলাদেশে সফল বিপ্লবের অনেকখানিই নির্ভর করবে উন্নয়ন প্রশ্নে সঠিক রণনীতির উপর। ক্ষেতমজুরদের দৃষ্টিকোণ থেকে এক্ষেত্রে এক বড় দাবী হবে সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী বাজারের শোষণ প্রতিহত করা এবং কৃষিতে ধনবাদ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া রোধ করে অধনবাদী বিকাশের পথ উন্মুক্ত

করা। এই প্রসঙ্গেই আসে সম-স্বার্থ সম্পন্ন অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে মিলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে ক্ষেতমজুর শ্রেণীর অংশগ্রহণ ও ভূমিকার প্রশ্নটি। আজ গ্রামাঞ্চলে যে ষাট থেকে সত্তর ভাগ শ্রমশক্তি বিক্রেতা ক্ষেতমজুর এবং গরীব ও মধ্য-কৃষক রয়েছেন এরা সচেতন ও সংগঠিত হলে গ্রামাঞ্চলে তাদের মিলিত শক্তি জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে এক নতুন রাজনৈতিক-সামাজিক ভারসাম্য সৃষ্টি করবে।

গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক জোটে অংশগ্রহণের ব্যাপারটি এই দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিগত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সময় ১৯৮৫ সালের ১৪ই অক্টোবর তারিখে ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউতে ১৫-দল আহূত মহাসমাবেশে যে ২১-দফা উপস্থিত করা হয়, তা' ক্ষেতমজুরদের স্বার্থের অনুকূল বিধায় হাজার হাজার ক্ষেতমজুর এই মহাসমাবেশে অংশ নেন। নীচে আমরা ২১-দফায় কৃষি-অর্থনীতি, কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের স্বার্থ-সম্বলিত দাবীর অংশটি তুলে ধরছি ;

"**দাবী-৩**—কৃষিখাতে ভর্তুকি হ্রাসের নীতি বাতিল করতে হবে। সার, বীজ, তেল, কীটনাশক ঔষধ, সেচযন্ত্র প্রভৃতি কৃষি-উপকরণের মূল্য শতকরা ৫০ ভাগ কমাতে হবে এবং সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে। বর্গাচাষী ও গরীব কৃষকদের সুদ মুক্ত ঋণ ও অন্য কৃষকদের নামমাত্র সুদে ঋণ দিতে হবে। কৃষকদের ঋণের উপর ঘুষ নেয়া কঠোরভাবে বন্ধ করতে হবে। ফসলের ন্যূনতম ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ ও তার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। ইজারাদারী ব্যবস্থা বিলোপ করতে হবে। ১৫ বিঘা পর্যন্ত জমির উপর কোন নামেই খাজনা-কর নেয়া চলবে না। জমির উপর বর্ধিত খাজনা-কর কমাতে হবে।

দাবী-৪—খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে "খোদ কৃষকের হাতে জমি ও সমবায়" এই নীতির ভিত্তিতে আমূল ভূমি-সংস্কার সাধন এবং পশ্চাৎমুখী সামন্তবাদী ব্যবস্থার অবশেষ নির্মূল করতে হবে। কৃষি-ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ত্বরান্বিত করতে হবে। ভূমি মালিকানার সিলিং আরও কমাতে হবে। উদ্বৃত্ত ও খাসজমি

জোতদার-ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে হস্তান্তর অযোগ্য ও সমবায় গঠনের শর্তে বিতরণ করতে হবে।

ভূমি থেকে বর্গাচাষী উচ্ছেদ কঠোরভাবে দমন করতে হবে এবং বর্গাচাষীর পক্ষে ফসলের তিনভাগের দুইভাগ তথা "তেভাগা" চালু করতে হবে।

দাবী-৫—ক্ষেতমজুরের সারা বছরের কাজ, চার সের সমমূল্যের নিম্নতম দৈনিক মজুরী দিতে হবে। আই. এল. ও কনভেনশন মোতাবেক সকল কৃষি-ফার্ম শ্রমিক ও ক্ষেতমজুরদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দিতে হবে। ক্ষেতমজুরদের জন্য রেশন চালু করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে বিদেশী সাহায্য সংস্থাগুলোর তৎপরতা বন্ধ করতে হবে।"

নিজের স্বার্থের কারণেই ক্ষেতমজুর শ্রেণী গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামে আগ্রহী। সাম্প্রতিক জাতীয় ৫-দফা আন্দোলনকে গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতি এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে। প্রয়োজনে আগামীতেও করবে। বস্তুতঃ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফ্রন্টকে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ফ্রন্টে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে ক্ষেতমজুর শ্রেণী এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ক্ষেতমজুর আন্দোলনকে সঠিকভাবে দাঁড় করাতে পারলে আজকের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে উপস্থিত অনেক কানাগলি থেকেও মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

শেষের আগে

ভূমিহীন, কর্মহীন, অন্নহীন, ভুখা-নাঙ্গা এই ক্ষেতমজুর শ্রেণী আমাদের জনগোষ্ঠীর সেই অংশ যাদের উদ্দেশ্যেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

"এই সব মূঢ়-ম্লান-মূক মুখে দিতে হবে ভাষা
এই সব ভগ্ন হৃদয়ে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

১৯৮০ সালে তার জন্মলগ্ন থেকেই ক্ষেতমজুর সমিতির অসংখ্য ত্যাগী কর্মী ঠিক এই কাজটাই করছেন। যে অব্যক্ত যন্ত্রণায় এতদিন ক্ষেতমজুর শ্রেণী গুমড়ে মরেছে, সংগঠনের সোনার কাঠির পরশে তা' আজ ভাষা পেয়েছে। মহানগরী ঢাকা থেকে শুরু করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অসংখ্য মিছিল-মিটিং-এ লক্ষ লক্ষ ক্ষেতমজুররা আজ দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠছে—"কাজ চাই, মজুরী চাই—বাঁচার মত বাঁচতে চাই।" এ যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। যুগ যুগের শোষণ ও নিপীড়নের পাষাণ ভেঙ্গে এই অগণিত ক্ষেতমজুর যত দ্রুত বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত বেরিয়ে আসবে, আমাদের সকলের কাঙ্খিত সমাজ-বিপ্লব ততই ত্বরান্বিত হবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। "মুঘল আমলে কৃষি-ব্যবস্থা"—ইরফান হাবীব।

২। 'বাংলাদেশের অর্থনীতি"—অজয় রায়, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

৩। "বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা"—নজরুল ইসলাম, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

৪। "বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতি"—এম. এম. আকাশ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

৫। "মার্কস-এঙ্গেল্‌স রচনা-সংগ্রহ", প্রগতি প্রকাশনী, মস্কো।

৬। "লেনিন রচনা-সংকলন", প্রগতি প্রকাশনী, মস্কো।

৭। "Development Impact of the Food-For-Work Program in Bangladesh", BIDS, December, 1985.

৮। কার্ল মার্কস : "ক্যাপিটাল", তৃতীয় খণ্ড।

৯। "সমাজ-নিরীক্ষণ", জুলাই, ১৯৮৩।

১০। ক্ষেতমজুর সমিতির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম প্রদত্ত ক্ষেতমজুর সমিতির ১ম ও ২য় জাতীয় সম্মেলনের রিপোর্ট।

১১। 'রাজনৈতিক রিপোর্ট", চতুর্থ কংগ্রেস, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, এপ্রিল, ১৯৮৭।

১২। দৈনিক "সংবাদ"।

১৩। সাপ্তাহিক "একতা"।

১৪। মাসিক "মুক্তির দিগন্ত"।

১৫। "Process in Landless Mobilisation in Bangladesh: Theory & Practice", FRM Hasan, BIDS, December, 1985.

১৬। "বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো", ১৯৮১।

১৭। ভারতীয় ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের ৬ষ্ঠ সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদকের

রিপোর্ট।
১৮। " 'সমবায় প্রসঙ্গে' লেনিনের রচনা", সেরগেই সেরায়েভ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪।
১৯। "সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা, টার্গেট গ্রুপ এবং কৃষক মুক্তি", আম্রু মুহাম্মদ।
২০। "অ্যাকশন গ্রুপ স্বেচ্ছামূলক সংস্থা: সাম্রাজ্যবাদী রণনীতির একটি দলিল", প্রকাশ কারাট, 'মার্কসবাদী পথ', ৪র্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা ১৯৮৫, কলিকাতা।
২১। "এনজিও সচেতনায়নের সাম্রাজ্যবাদী দর্শন: একটি উপক্রমনিকা", মোফাজ্জালুল হক।
২২। "উন্নয়ন, সচেতনায়ন ও গ্রামীণ ব্যাঙ্ক", আতিউর রহমান।
২৩। "Credit for the Rural Poor : The Grameen Bank Experience", Mahboob Hasan, BIDS, 1985।
২৪। "ওয়ার্ল্ড ভিশনের কর্মতৎপরতা ও গারো সমাজে সচেতনতা"— সঞ্জীব দ্রং।
২৫। "লেভ তলস্তয়—রুশ বিপ্লবের আয়না", ভি. আই. লেনিন, প্রগতি প্রকাশনী, মস্কো।
২৬। "বাংলাদেশের ভূমি-ব্যবস্থা সংকট ও সমাধান"—অজয় রায়, বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ১৯৮৩।
২৭। "বাংলাদেশে কৃষি শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ", (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পর থেকে সমসাময়িক বাংলাদেশ পর্যন্ত), আয়শা বানু, সন্দর্ভ, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭।
২৮। "পশ্চিমবঙ্গের বর্গাদার", অশোক রুদ্র, দেশ পরিচয় গ্রন্থমালা, কলকাতা, ১৯৮১।
২৯। "ভূমি-সংস্কারের স্বরূপ", তিমির বসু, দেশ পরিচয় গ্রন্থমালা, কলকাতা, ১৯৮২।
৩০। "পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেতমজুর", অশোক রুদ্র, দেশ পরিচয় গ্রন্থমালা, কলকাতা।

৩১। "বাংলাদেশে ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ", বি. কে. জাহাঙ্গীর, সমাজ-নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৪।

৩২। শেখর দত্ত, "তেভাগা আন্দোলন", বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪।

৩৩। A. R. Khan (Dr.) : "Poverty and Inequality in Rural Bangladesh".

৩৪। R. Sen., "Political Elites in Bangladesh", University Press Ltd. Dhaka, 1986.

৩৫। রেহমান সোবহান, "বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারার উপর বৈদেশিক উপাদানের প্রভাব"।

৩৬। Mahboob Hossain, "Present Agrarian Structure and Agricultural Growth in the Post Partition Period", paper, 1978.

৩৭। K. Westergaard, "State & Rural Society in Bangladesh : A Study in Relationship".

——